মুঠো মুঠো আশা

সুনীল চক্রবর্তী

47172
2.8.67
AGARTALA

পরিবেশক

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৬৬, বিধান সরণী, কলিকাতা - ৬

প্রকাশ করেছেন :
পি. সিকদার
১০৩, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৪

ছেপেছেন :
প্রদীপকুমার হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৩৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
অরুণ বণিক

বেঁধেছেন :
প্রোগ্রেসিভ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৪৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

মূল্য : ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

বাবা মায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার কথা

প্রেরণার তাগিদেই—সাহিত্যিকের কলম চলে। কিন্তু বিশেষভাবে এই বইটি লেখার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছেন বিশ্বরূপা থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার শ্রীরাসবিহারী সরকার মহাশয়। তিনি কিছুদিন আগে আমাকে একটি হাসির নাটক লিখতে বলেন। আব তারই ফল স্বরূপ এই বই 'মুঠো মুঠো আশা'। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এরই নাট্যরূপ—'মহুয়া' নাট্য সংস্থা কর্তৃক রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বেশ কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

পরিশেষে বন্ধুবর প্রফেসর সুধাংশু ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। এবং দ্বিধাহীন ভাবে স্বীকার করছি যে তিনি যে শুধু আমার ব্যক্তিগত বন্ধুই তা নয়—তিনি আমার একজন সাহিত্যের অনুরাগী ও আমার সাহিত্যিক সাফল্যের পেছনে তাঁর সক্রিয় সহৃদয় প্রচেষ্টা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানালাম না—শুধু অন্তরের ভালবাসা জানালাম।

কলিকাতা
১৫ই বৈশাখ : ১৩৫৭

সুনীল চক্রবর্তী

'ফার্স্ট্ স্ট্রোক্'—'লাস্ট্ ব্রেথ্'।

শিবপদ মুখুজ্জে-চোখ বুঁজলেন। একেবারে আচম্কা-মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে। বলতে গেলে অকালেই। সম্পত্তির মধ্যে রেখে গেলেন—বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে একখানা ছোট বাড়ী। আর পরিজনদের মধ্যে রেখে গেলেন-স্ত্রী সান্ত্বনা দেবী, দুই ছেলে—শেখর ও সরিৎ আর এক মাসের একটি মেয়ে টুটুলকে। নগদ তেমন কিছু রেখে যেতে পারলেন না। ফলে সংসার হয়তো অচল হয়েই পড়ত—যদি না শেখর একটা চাকরী পেয়ে যেত। শেখরের মাসিক আয় সচ্ছলতা না আনলেও—তাই দিয়েই সান্ত্বনা দেবী সংসার চালিয়ে আনলেন শেখরকে বিয়ে করিয়ে মমতাকে ঘরে আনা পর্যন্ত। মমতাকে তিনি জহুরীর চোখ দিয়ে খুঁজে-পেতে এনেছেন। কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল—ছেলেকে বিয়ে করিয়ে তিনি যে বউকে ঘরে আনবেন আসলে সে ই বসবে শাশুড়ীর আসনে আর তিনি ছেলের বউয়ের মত সংসারের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে নিরুদ্বেগে ধর্মকর্ম করবেন। তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু বাদ সাধল নিয়তি। সবার কপালে সব সুখ সয় না। নিয়তি যেন এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল। মমতাকে ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গে যেন সান্ত্বনা দেবীর কাজ শেষ হয়ে গেল। তাই বছর দুই যেতে না যেতেই ওপারের ডাক পড়ে গেল। যাবার আগে শেখর, সরিৎ, টুটুলসহ—সংসার সুদ্ধ মমতার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ওপারে চলে গেলেন।

অতএব যে বয়সে হাল্কা মনে খুশীর হাওয়ায় ভর করে চলার কথা—সেই বয়সেই সংসারের বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিতে হ'ল মমতাকে। সান্ত্বনা দেবী যে ভার তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন—তা প্রাণপণে বহন করে চলল মমতা। টুটুলের তো বটেই—সরিতেরও মায়ের বয়সী না হয়েও—মায়ের স্নেহ দিয়ে মায়ের অভাব মেটাল মম-

, নাতী, নাতনীসহ

মমতা—মমতার আধার। মমতা—আজকালকার মেয়েদের মধ্যে যেন ব্যতিক্রম। একটা স্নিগ্ধ শ্যামল লক্ষ্মীশ্রী তার সর্বাঙ্গে।

সরিতের শত রকম ফরমাস—টুটুলের যত রকম আবদার সব হাসিমুখে পূরণ করে আসছে মমতা। অবশ্য শেখরেরও ছিল এ বিষয়ে পূর্ণ সহযোগিতা।

মাঝে মাঝে শেখর ঠাট্টা করে বলে—বিয়ের বাজারে বেশ চড়া দামেই বিকোতে পারতুম, যদি না তোমার কাছে বিনামূল্যে বিকিয়ে যেতুম।

মমতা হেসে জবাব দেয়—হুঁ, তা বৈকি! আমি যে কিনতে গিয়ে তোমাদের কাছে কেনা হয়ে গেলুম, তা তো কিছুই ব'লছ না।

সংসারটি আর একটু ভালভাবে চলবার ব্যবস্থা হ'ল। সরিৎ এম. এস্-সি. পাশ করে একটা ভাল চাকরী পেয়ে গেল।

.মমতা নিঃসন্তান। সে জন্যে ক্ষোভ নেই। অন্ততঃ বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। সংসারের পরিজন নিয়েই রাতদিন ব্যস্ত। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই, নিজেকে নিয়ে ভাববে কখন? কিন্তু এখন তার একজন সহকারিণী দরকার হয়ে পড়েছে। মানুষের শরীর তো! একটু বিশ্রামের দরকার বৈকি! তা ছাড়া কথা বলারও একটা লোক থাকা চাই। শেখর আর সরিৎ অফিসে চলে গেলে, বাড়ীতে থাকার মধ্যে থাকে টুটুল আর সুরুচির মা। এদের সঙ্গে কিই বা বলা যায়! ঠিক এই কথাটাই শেখরকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছে না মমতা। যতবারই বলছে ঠাকুরপোকে বিয়ে করিয়ে একটি বউ আনো ঘরে, ততবারই শেখর বলছে—বিয়েতো করানোই উচিত, কিন্তু—।

ঐ কিন্তুতে গিয়েই আটকে যায় শেখর। সেদিন মমতা একদম ক্ষেপে গেল। বিকেলে অফিস ফেরত শেখর আর সরিৎকে জলখাবার দিয়ে মমতা বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললে—তোমরা ভেবেছ কি

আমার কি বিশ্রামের প্রয়োজন নেই নাকি?

সরিৎ তক্ষুণি কথাটাকে স্বীকার করে নিয়ে বললে—সত্যিই দাদা, বৌদির একটু বিশ্রামের দরকার।

মমতা বললে—দরকার যদি বোঝো, তাহলে ব্যবস্থা কর না কেন ?

সরিৎ বললে—দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি। বলে শেখরের দিকে তাকিয়ে বললে—দাদা, তুমি দু'মাসের ছুটি নিয়ে, বৌদিকে নিয়ে কোথাও চেঞ্জে চলে যাও।

সরিৎ কথাটা শেষ করে এমন ভাবে দাদা বৌদির মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাল, যে এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর হতে পারে না, কিন্তু অপ্রস্তুত হতে হল। তার এই প্রস্তাব শুনে দাদা তো হাসতেই লাগলেন। বৌদি রেগে গিয়ে বললে—হয়েছে পণ্ডিত প্রবর, আপনি এবার দয়া করে থামুন। আমি তোমার দাদাকে নিয়ে চেঞ্জে হাওয়া খেতে যাই, আর এসে দেখি, বাড়ীটাসুদ্ধ তোমরা গি-' র গড়ের মাঠে হাওয়া খাচ্ছ।

সরিৎ আপন বক্তব্যটাকে আরো পরিস্ফুট করবার জন্যে শেষ চেষ্টা করে বললে—না—না—আমি বলছিলাম কি—

কিন্তু তার বক্তব্যটা আর পরিস্ফুটিত হতে পারল না। তার আগেই মমতা বাধা দিয়ে বললে—থাক্, আর বলতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে। এখন খাওয়া হয়ে থাকলে, লাইব্রেরী না ক্লাব কোথায় যাবার আছে, দয়া করে সেখানে যাও।

মোটের উপর সরিতের এমন চমৎকার প্রস্তাবটা একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল। এরপর আর কিছু বলার উৎসাহ না হওয়াই স্বাভাবিক; সরিৎ বুঝল এবার তার সরে পড়াই উচিত। সুযোগও একটা জুটে গেল।

কারণ হঠাৎ শোনা গেল তর্জন-গর্জন—বারবার বলছি—জ্বর হলে চান করতে নেই, ভাত খেতে নেই, পাড়া বেড়াতে নেই—, তা কে কার কথা শোনে! এখন যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো, এখন কে দেখবে? আমি পারব না। থাকো চিৎ হয়ে শুয়ে।

সকলে সচকিত হ'য়ে দেখল,—ছেলে, বউ, নাতী, নাতনীসহ

একটি গোটা পরিবারকে একটা ছোট্ট টিনের বাক্সের মধ্যে চাপিয়ে নিয়ে এসে ঢুকল টুটুল।

সকলেই হেসে উঠল। সরিৎও এই ফাঁকে সরে পড়ল।

টুটুল কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, ঘরের কোণে গিয়ে আপন সংসার বিছিয়ে বসল। বসে বাক্সের মধ্যে তার দুষ্টু ছোট মেয়েটাকে, একফালি ন্যাকড়া চাপা দিয়ে শুইয়ে দিল। বল্লে —ফের যদি তোমাকে পাড়া বেড়াতে দেখি, তবে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। ঠ্যাং ভেঙে একদম ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে দেব না—!

বিভিন্ন সময়ে টুটুলকে যে সব কথা বলে মমতা সস্নেহ শাসন করে থাকে, টুটুলও ঠিক সেইভাবে তার দুষ্টু মেয়েকে শাসন করছে।

হাসি থামিয়ে বললে মমতা—না, সত্যি বলছি, ঠাকুরপোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করো।

শেখর বললে—তুমিও বলছ, আমিও ভাবছি।

মমতা বললে—ভাবতে ভাবতে আরো কয়েকটা বছর পার করে দিতে চাও নাকি? তাহলে সত্যি বলছি আমি বাবার বাড়ী চলে যাব কিন্তু।

টুটুল এতক্ষণ তার সংসার নিয়ে মহা ঝামেলায় ব্যস্ত ছিল। তাই দাদা-বৌদির প্রথম দিকের কথাগুলো তার কানে যায়নি। শুধু বৌদির চলে যাবার কথাটা কানে যেতেই, টুটুল উঠে এসে বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে বললে—কোথায় যাবে বৌদি?

মমতা গম্ভীর ভাবে বললে—যাব, বাবার বাড়ী।

টুটুল আবদার করে বললে—আমিও যাব।

হেসে উঠল শেখর। বললে—এখন সামলাও। এরপর খোকা শুনলে হয় তো, সেও যেতে চাইবে। তারপর বাকী রইলাম তো আমি? আমিও রাগ করে গিয়ে শ্বশুরবাড়ী উঠব। এ বাড়ীতে থাকবে শুধু সুরুচির মা। কথা শেষ করে হো হো করে হেসে উঠল শেখর।

মমতাও হেসে ফেললে, বললে—না, হাসবার কথা নয়। কথাটা কটু ভেবে দেখো। তাছাড়া ঠাকুরপোর এই তো উপযুক্ত বয়স—।

শেখর বললে—বিয়ে করানো দরকার বৈকি! কিন্তু মেয়ে কোথায় পাই—?

মমতা বললে—অবাক করলে যা হোক! মেয়ের আবার অভাব নাকি!

শেখর বললে—আমি যেরকম মেয়ের কথা বলছি—তার সত্যিই অভাব। শুধু অভাব নয় মমতা, আমার আশঙ্কা—, হয় তো মনোমত মেয়ে পাওয়াই যাবে না। কারণ আমি চাই, এমন একটি মেয়ে, যে রূপে, গুণে ঠিক তোমার মতই হবে।

মমতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—ওঃ এই সমস্যা! বাঁচালে যাহোক! তা আমার মত পেঁচী খুঁজলে, অনেক পাবে গো অনেক পাবে। আমি কিন্তু তাও বলছি না। আমি বলছি আমার চেয়েও একটি ভাল মেয়ে ঘরে আনতে। মা যেমন আমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে চোখ বুজেছেন, আমিও যেন তার হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। যাক্ সে কথা—। তা ঘরের মধ্যে বসে থাকলে তো আর কিছু হবে না। একটু খোঁজ খবর করো।

শেখর বললে—আচ্ছা আচ্ছা দেখব—। বলে—বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

পরদিন অফিসে বেরোবার সময় মমতা কথাটাকে আবার মনে করিয়ে দিল। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে ফিরে বললে—কিন্তু—

ধমক দিয়ে বলে উঠল মমতা—আবার কিন্তু—।

তাড়াতাড়ি সংশোধন করে শেখর বললে—কিন্তু না—, তবে—

মমতা রেগে গিয়ে বললে—কিন্তু ছেড়ে, এখন বুঝি, আবার 'তবে'-তে গিয়ে ঠেকেছে?

শেখর বললে—না—না—।

তারপর দেখল—, আর কোনো ওজর আপত্তি খাটবে না। তাই সে বললে—আচ্ছা, আজই আমি দেখব।

বলে ঝট্ পট্ বেরিয়ে পড়ল। আর ভাগ্যি ভাল, পথেই দেখা এক পরিচিত ঘটকের সঙ্গে। কথাটা শুনেই, ঘটক মশাই এক চটকদার পাত্রীর বর্ণনা শুনিয়ে দিলেন।

শেখর বললে—ঠিক আছে, আমার অফিসে পাঁচটার সময় যাবেন। আজই মেয়ে দেখতে যাব।

ঘটক বললেন—আচ্ছা।

আসলে সরিৎকে বিয়ে করাতে যে অমত শেখরের তা নয়। মত তার পুরোপুরিই। কিন্তু ঐ এক ধরন। করে কর্মে যে কিছু জুটিয়ে আনবে, তা শেখরের দ্বারা হবার নয়। কেউ যদি যোগাড় করে এনে দেয় তাতে তার আপত্তি নেই। বরঞ্চ সে সুখীই হয়।

মমতা তাই অনেক সময় ঠাট্টা ক'রে বলে—তোমাদের সংসারে আমি এসেছিলুম বলে যা রক্ষে! না হ'লে যে তোমাদের কী দশা হ'ত তাই ভাবি।

শেখর তার উত্তরে বেশ তৎপরতার সঙ্গেই বলে—আহা-হা মা তো সেই জন্যেই দেখেশুনে অদ্ভুত করিৎকর্মা একটি বউ এনেছেন ঘরে। না হ'লে বাংলা দেশে কি মেয়ের অভাব ছিল নাকি? হুঁ—!

অগত্যা মমতাকে মুখ বন্ধ করতে হয়।

সময়ানুবর্তিতার পরীক্ষা যদি কখনো হয়, তবে ঘটক আর দালালরাই যে তাতে প্রথম স্থান অধিকার করবে—এ একেবারে অবধারিত।

পাঁচটা বাজার অনেক আগেই, ঘটক মশাই শেখরের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। তারপর ঘটক মশাই শেখরকে এমন একজনের বাড়ী নিয়ে গেলেন, ছেলেবেলায় যাঁর হাতের কানমলা খেয়েই শেখর বর্ণমালা শিখেছিল।

ভবতারিণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত, শ্রীসুধামাধব ভট্টাচার্য, বাগবাজারে কাঁটাপুকুর লেনে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে

থাকেন। সামনে একফালি বারান্দা আছে। সেইটিকেই পণ্ডিত মশাই বসবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন।

পণ্ডিত মশায়ের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। স্ত্রী প্রভাময়ীর পঞ্চাশ, মেয়ে অনুসূয়ার কুড়ি, ছোট ছেলে পিণ্টুর বারো বছর। এই নিয়েই পণ্ডিত মশায়ের সংসার।

এঁরা মধ্যবিত্ত। বলাবাহুল্য এরা বিত্তসম্পন্ন নয়, এরা বিত্তহীন। দিনরাত্তির চব্বিশ ঘণ্টাকে যাদের টেনে হিঁচড়ে পার করতে হয়, ডাইনে আনতে যাদের বাঁয়ে কুলায় না—পান আনতে চুন নেই, নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায়—এঁরা হলেন সেই মধ্যবিত্ত।

পণ্ডিত মশায়ের সংসারটিও ঠিক এই রকম একটি শিবের সংসার। তার উপর পণ্ডিত মশাই আত্মভোলা প্রকৃতির লোক। অতএব এই সমস্ত সদ্‌গুণের মধ্যে যে-কোনো একটি থাকলেই সংসার ভেসে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো বা যেতও—যদি না প্রভাময়ী সংসার তরণীর হালটি শক্ত হাতে ধরতেন। তিনিই ঢেউয়ের পর ঢেউ কাটিয়ে, প্রতিকূল আবর্তের মধ্যে তরণীটিকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়ে এ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে এসেছেন।

এদিকে দরিদ্রের সংসারে মেয়ে যত স্বাস্থ্যবতী হয়ে বাড়তে থাকে, বাপ মায়ের দেহও তত চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে যেতে থাকে।

তাই অনসূয়াও যখন শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে তর্ তর্ করে মাথায় বেড়ে যেতে লাগল, তখন তার এমন যে আত্মভোলা বাবা পণ্ডিত মশাই আর তার মা প্রভাময়ীর মাথাটাও ক্রমেই নুয়ে পড়তে লাগল।

স্কুলের কাজ সেরে সকাল সন্ধ্যায় টিউশনী করে শ্রান্ত ক্লান্ত পণ্ডিত মশাই ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বাড়ী ফেরেন। প্রভাময়ী সব বুঝেও তাগিদ্ দেন—কই, কোথাও পাত্রের সন্ধান পেলে?

পণ্ডিত মশাই বলেন—পেলাম বৈকি! যে সব যোগ্য পাত্রের সন্ধান পেয়েছি, আমরা সেই পাত্রের পক্ষের যোগ্য নই। আর যাদের পেয়েছি, সেই সব পাত্ররা আমার মেয়ের যোগ্য নয়।

অবশ্য সম্বন্ধ যে দু'একটি না এসেছিল এমন নয়। কিন্তু এলে হবে কি, ঐ একজায়গায় এসেই তো সব ভেস্তে যায়।

এই তো সেদিন এক সম্বন্ধ এসেছিল। পাত্রটি বি. এ. পাশ। ভাল চাকরী করে। দেখতে শুনতে চলনসই। কলকাতায় বাড়ী আছে। পাত্রপক্ষ থেকে পাত্রের বাবা, কাকা, মামা, পিসে মিলিয়ে প্রায় ডজনখানেক লোক এসেছিল অনুসূয়াকে দেখতে। দেখতে তো নয়, যেন পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের সামনে—প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নিতে।

নানাভাবে খুঁটিয়ে খাটিয়ে দেখে, অবশেষে পাত্রপক্ষ রায় দিলেন—হ্যাঁ মেয়েটি মোটামুটি মন্দ নয়।

তারপর অনুসূয়াকে লক্ষ্য করে বললেন—আচ্ছা মা, তুমি এবার যেতে পার।

অনুসূয়া ঘরের ভেতর গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পণ্ডিত মশাই এতক্ষণ মাথাটা নুইয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবটা যেন এই—'আমি মেয়ের বাপ হয়ে যে অপরাধ করেছি, তার জন্যে আমি মাথা পেতে দিয়েই দাঁড়িয়ে আছি। অতএব হে ধর্মের অবতারগণ! আপনারা আমার অবনত মস্তকে যে কোনোরূপ দণ্ডই দিতে পারেন। আমি তা নিতে সর্বদাই প্রস্তুত। এমন কি মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলতেও পারেন—তাতেও আমি আপত্তি করব না।

যাই হোক পাত্রপক্ষীয়দের রায় শুনে, তিনি একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রভাময়ী বিধাতার উদ্দেশ্যে গোটাকয়েক প্রণাম পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে পাত্রের বাবা তখন কথার সঙ্গে কিছুটা বিনয় মিশিয়ে বললেন—দেখুন, ছেলের বাপ বলে, আমাকে কসাই ভাববেন না যেন পণ্ডিত মশাই। পণ বলুন, দাবি দাওয়া বলুন, ওসব আমাদের কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এসব আমরা আদপে পছন্দই করি না। তবে কি জানেন—

পণ্ডিত মশাই ঝুঁকে বললেন—তবে কী— ক আছে, ঠিক আছে—

পাত্রের বাবা বললেন—তবে আমাদের বহু ল। পাত্রের বাবা বলে বউয়ের গলায় এক ছড়া হার থাকবে। তা আপনি দিতে পারেন—কি সাত ভরি দিয়েও দিতে পারেন, ই দেব না। এটাই আটকাবে না। আমরা কসাই নই, বুঝলেন। আর—

মন—

পণ্ডিত মশাই ঢোক গিলে বললেন—আর— ?

পাত্রের বাবা বললেন—আর ছেলের মায়ের ইচ্ছে, ঐ মানতাসা না যেন কী বলে, তাই ছেলের বউয়ের হাতে থাকবে। তা আপনি যে কয় ভরির খুশি দেবেন। আর—

পণ্ডিত মশাই ঢোক গিলতে গিয়ে দেখলেন, জিভটা তাঁর যেন ক্রমশই শুকিয়ে আসছে। তিনি বললেন—আর— ?

পাত্রের বাবা বললেন- ছেলের দাদুর ইচ্ছে, নাতবৌ-এর হাতে দু'গাছা বালা থাকবে। আর ছেলের দিদিমার ইচ্ছে কানপাশা। ছেলের পিসির ইচ্ছে টিক্‌লি। ছেলের ঠাকুরমার ইচ্ছে আর্মলেট। আর ছেলের মাসি বলেছিল—মাথায় সোনার চূড়োর কথা—। আমি বাধা দিয়ে বলেছি, না—না—এ চাইতে গেলে মেয়ের বাবার উপর অবিচারই করা হবে। আমি তো আর কসাই হতে পারব না।

কথা ক'টি বলে হেঃ হেঃ করে হাসলেন খানিক।

পণ্ডিত মশায়ের ঢোক গেলা বন্ধ হয়ে গেছে। দরজার আড়ালে প্রভাময়ী অনবরত ঘামতে সুরু করেছেন।

পাত্রের বাবা হাসি থামিয়ে বললেন—তা এসব আপনি যেমন ভাবে পারবেন দেবেন, ওতে কিছু যায় আসে না। দাবি আমাদের কিচ্ছু নেই জানবেন। খাট, বিছানা, দ্রব্যসামগ্রী, এসব তো আর কিছু কথা থাকে না, ও তো দেবেনই। তবে ছেলের নিজের ইচ্ছে কিন্তু একটা রেডিওগ্রামের। তা তো আর সম্ভব নয়। আপনি বরঞ্চ একটা অল্‌ওয়েভ সেট্‌ই দেবেন। আর একটি রিশট্ ঘড়ি, আর একটি পার্কার সিক্‌স্‌টি পেন। এ এমন কিছু নয় অবশ্য। তাছাড়া

, তেই হবে। আবার এটাকে পণ বলে ভা
অবশ্য সম্বন্ধ যে হু'এ
। এক পয়সাও চাই না, বুঝলেন, হেঃ হেঃ-
হবে কি, ঐ একজায়গায়
।ত্রের বাবা ডাইনে বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে কৃতা
এই তো সেদিন
ভাল চাকরী
ত মশায়ের মুখখানা যে 'হা' হয়ে গিয়েছিল তা বোধহয়
আছে।
নি নিজেও বুঝতে পারেন নি। কথা বলতে গিয়েই তিনি টের পেলেন। হাত জোড় করে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—একটা কথা বলব— ?

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন—বলুন—বলুন— ।

পণ্ডিত মশাই বিনীত ভাবে বললেন—মেয়েটিকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে ত্রুটি করিনি। দাবি দাওয়া অবশ্য আপনাদের কিছু নেই তা তো দেখতেই পেলাম। শুধু পাত্রপক্ষের এত জনের ইচ্ছে আমার একার পূরণ করতে হবে এই যা।

পাত্রের মামা সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন—তা আর কী করবেন বলুন— ! ঘাড় থেকে বড় বোঝা নামাতে গিয়ে এই সামান্য বোঝাটুকু তো বহন করতেই হবে। আসলে যে আপনি মেয়ের বাপ, বুঝলেন না? বলে হা হা করে হেসে উঠলেন। যেন কত রসিকতাই না করলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—তবু তো আপনার ভাগ্য ভালই বলতে হবে। অল্পতেই আপনি রেহাই পেলেন। আমার মেয়ে তো মশাই এক কাঁড়ি নিয়ে নেমেছে।

পণ্ডিত মশাই তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে বললেন—ভাগ্য আমার ভালই, না হ'লে আপনাদের মত লোকের পায়ের ধুলো পড়বে কেন? তবে কি জানেন—আপনাদের এতজন লোকের ইচ্ছে আমার একার পূরণ করতে হবে কিনা। তাই তার আগে আপনারা সবাই মিলে আমার একটা ইচ্ছে যদি পূরণ করতেন দয়া করে—

সকলেই সমবেত ভাবে বলে উঠলেন—বলুন—বলুন কী আপনার ইচ্ছে?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আমার ইচ্ছে, আমি এসবের কিছুই দেব না।

সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে—

কথাটা বলেই যেন তাঁদের খেয়াল হল। পাত্রের বাবা বলে উঠলেন—কী বললেন ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আমি এসবের কিছুই দেব না। এটাই আমার ইচ্ছে। কারণ আমার দেবার ক্ষমতা নেই।

এ কথার পর পাত্রপক্ষের সকলেই উঠে পড়লেন। মুখে বললেন—তাতে কি—তাতে কি—, আচ্ছা পরে খবর দেব'খন। কেমন ?

বলে নমস্কার আদান-প্রদান করে চলে গেলেন।

পাত্রপক্ষ চলে যাবার পর পণ্ডিত মশাই প্রভাময়ীকে বললেন—আচ্ছা অনুর কি বিয়ে না দিলেই নয় ? ওকে আমি আরো পড়াব।

প্রভাময়ী বুঝলেন –এ কতখানি ব্যথার কথা, কতখানি ব্যর্থতার কথা! তিনি পণ্ডিত মশাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—থাক্, ভেঙে পড়তে নেই, আরো চেষ্টা করে দেখ।

তারপর প্রভাময়ীর বোনপো একদিন বেড়াতে এসেছিল।

প্রভাময়ী তাকে কথাটা বলতেই সে বললে—আচ্ছা আমি দেখব।

ওদিকে সে আর কোথায় দেখবে, সে বললে এই ঘটক মশাইকে। ঘটক মশাইও তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যেই শেখরকে নিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী।

ঘটক মশায়ের যোগাযোগ করা পর্যন্তই যা কাজ। তারপরই দেখা গেল পটপরিবর্তন হয়ে গেল। পরিচয়ের পালা সুরু হ'তেই এক নূতন দৃশ্যের অবতারণা হ'ল।

একটি ছোট ছেলে শ্লেট বগলে ভবতারিণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। তা বেশ কিছুদিন আগের কথা—ভবতারিণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক অবস্থায়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ী তখনও হয়নি। তখন স্কুল বসত-একটি ভাড়া করা বাড়ীতে। প্রথম দিকে ছাত্র তেমন জোটেনি। যে ক'টি জুটেছিল, সব ক'টিই পণ্ডিত মশায়ের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করেছিল। তার মধ্যে গুটিকয়েক ছেলে

মুঠো মুঠো আশা

ভাল ছাত্র বলেই হয় তো পণ্ডিত মশায়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার মধ্যে এই ছেলেটি অন্যতম।

ছেলেটিকে বড় ভাল লাগত পণ্ডিত মশায়ের। মন দিয়ে পড়াতেন, শেখাতেন। শেখাতে গিয়ে কানমলাও দিতেন, আবার বুকে জড়িয়ে ধরে আদরও করতেন।

পণ্ডিত মশায়ের বেশ মনে আছে, ছেলেটি একদিন এসে বললে—কাল থেকে আমি আর আসব না।

ধক্ করে উঠল পণ্ডিত মশায়ের বুকটা।

ছেলেটি বললে—আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। পণ্ডিত মশাই তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন—কোথায় যাবে?

ছেলেটি বললে—মামাবাবু দিল্লী বদলী হয়ে গেছেন তো, তাই আমি আমার মা-বাবার কাছে চলে যাব।

পণ্ডিত মশাই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—সেখানে গিয়ে পড়াশুনা ক'রো কিন্তু। কেমন? মানুষ হ'য়ো।

পণ্ডিত মশায়ের অন্তরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ছেলেটি চলে গেল।

অনেকদিন ধরে ছেলেটির স্মৃতি পণ্ডিত মশায়ের মন জুড়ে ছিল। আজ অনেক দিন বাদে তাঁর সেই প্রিয় ছাত্রটি এসে দাঁড়াল সামনে। আর অনেক দিন বাদে আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পণ্ডিত মশাই।

এই অদ্ভুত যোগাযোগে অভিভূত হয়ে গেল, গুরু শিষ্য উভয়েই।

এদিকে পণ্ডিত মশাই সুরু করে দিলেন মহা হৈ চৈ। তা এতই মাত্রা ছাড়িয়ে গেল যে তাঁকে থামাতে, প্রভাময়ীকে ছুটে আসতে হ'ল কলতলা থেকে।

পণ্ডিত মশাই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে উঠলেন—দেখ দেখ কে এসেছে!

অপরিচিত দু'জন ভদ্রলোককে দেখে, প্রভাময়ী মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে পণ্ডিত মশাই বলে উঠলেন

—আহা-হা—একে দেখে লজ্জা পেতে হবে না। এ আমার পুরোনো ছাত্র।

প্রভাময়ী বললেন—তা আগে ওদের বসতে দাও।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে পণ্ডিত মশাই বল্‌লেন—এই দেখ! দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আরে এটা তোমার নিজের বাড়ী বলেই মনে করবে।

শেখর এতক্ষণ ধরে ঐ প্রাণখোলা আত্মভোলা লোকটিকে দেখছিল, আর শ্রদ্ধায় তার মাথাটা নুয়ে পড়ছিল। পণ্ডিত মশায়ের কাছে পরিচয় দেওয়ামাত্র, তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন যে শেখরের প্রথম কর্তব্য প্রণাম করাটাই হ'য়ে ওঠেনি। এইবার সে পর্যায়ক্রমে পণ্ডিত মশাই ও প্রভাময়ীকে প্রণাম করল।

প্রভাময়ী হেসে বললেন—বোসো বাবা বোসো।

আগমনের কারণটা যেমন শেখরও এখন পর্যন্ত বলতে পারেনি, তেমনি ঘটক মশাইও নয়।

পণ্ডিত মশাই বলে চললেন—সে কি আজকের কথা! আরে শেখর নিজে থেকে পরিচয় না দিলে তো চিনতেই পারতাম না। ও যেই বললে—ছেলেবেলায় এই ভবতারিণী বিদ্যালয়ে নাকি ও পড়ত। তক্ষুণি আমি চিনে ফেললুম। তা অনু কই, পেণ্টু কই— ? ওদের ডাকো—

প্রভাময়ী বললেন—ওরা বেড়াতে গেছে।

ঘটক মশায়ের দিকে লক্ষ্য পড়তেই পণ্ডিত মশাই বললেন—আপনাকে তো—

ঘটক মশাই বললেন—আজ্ঞে সমীরবাবু আপনাদের মেয়ের জন্যে একটি ছেলের সন্ধান দিতে বলেছিলেন—, তাই শেখরবাবুকে আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছি। শেখরবাবুর ভাই কথাটা তার শেষ হতে পারল না—পণ্ডিত মশাই ও প্রভাময়ী একসঙ্গে বলে উঠলেন—তাই নাকি?

শেখর বললে—হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই, এম. এস-সি. পাশ করে এখন ভাল চাকরী করছে। তারই জন্যে—।

ঘটক মশাই বললেন—আপনাদের যে আগে থেকে একটা খবর দেব, তার সুযোগই দিলেন না শেখরবাবু। বললেন—যাব, আর মেয়েটি দেখে চলে আসব।

পণ্ডিত মশাই উৎসাহের সঙ্গে প্রভাময়ীকে লক্ষ্য করে বললেন—তাহলে অনুকে একবার ডাকো।

শেখর বলে উঠল—একটু দাঁড়ান। ঘটক মশাই, আজ কি আশীর্বাদের দিন আছে?

ঘটক মশায়ের এসব মুখস্থই থাকে। বললেন—কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় একটা দিন আছে।

শেখর বললে—কাল এসে আমি আশীর্বাদ করে যাব।

প্রভাময়ী তবু বললেন—তা একবার দেখে যাবে না বাবা?

শেখর হেসে বললে—আপনাদের মেয়ে, তাকে আর আমার দেখতে হবে না, আমার ভাগ্য ভাল, ঘটক মশাই আপনাদের কাছেই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আপনারা বরং আমার ভাইকে একবার দয়া করে গিয়ে দেখে আসবেন।

পণ্ডিত মশাই বলে উঠলেন—তাহ'লে আমিও অমনি কাল গিয়ে একেবারে আশীর্বাদ করেই আসব। তোমার ভাই যখন, তখন আমারও আর দেখতে হবে না।

শেখর বললে—বিয়েটা কিন্তু,আসছে লগনেই দিতে হবে। তারপর ঘটক মশাইকে বললে—সামনে বিয়ের লগন কবে আছে ঘটক মশাই?

ঘটক মশাই চট করে বললেন—আজ্ঞে সতরই মাঘ, সন্ধ্যা সাতটা চব্বিশ মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড গতে—

শেখর বলে উঠল—ব্যস্, ব্যস্, ওটাকে আর গত হ'তে দিয়ে কাজ নেই। ঐ লগনেই বিয়ে হবে।

ঘটক মশাই বললেন—আজ্ঞে ওটা গত হবার পরেই যে লগন।

শেখর বললে—তা আপনি যত খুশি গত করুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ লগনেই যে বিয়ে হবে, এ একেবারে অবধারিত। আর কোনো আগত লগনের অপেক্ষা আমি করব না।

প্রভাময়ী যেন ততক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি বললেন—বাবা, আমরা মেয়েটি ছাড়া যে আর কিছুই দিতে পারব না!

শেখর হেসে বললে—আমিও ঐ মেয়েটি ছাড়া আর কিছুই নিতে চাই না। আর এটাই হবে দেনপাওনার একমাত্র শর্ত।

আনন্দে পণ্ডিত মশাই আর প্রভাময়ীর চোখে জল এসে পড়ল। সাশ্রু নেত্রে পণ্ডিত মশাই শেখরের হাত দু'টো ধরে বললেন—শেখর—শেখর—।

তাঁকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে, শেখর উভয়কে প্রণাম করে বললে—আজ তাহ'লে আমি আসি।

প্রভাময়ী চোখের জল মুছে বললেন—সে কি! এখনই উঠবে কি বাবা? একটু—

শেখর বললে—কি—মিষ্টিমুখ করাবেন তো? সেটা কাল এসে খাব। চলুন ঘটক মশাই।

আকাশ-কুসুমকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে দিয়ে শেখর চলে গেল। অভিভূত হ'য়ে গেলেন পণ্ডিত মশাই ও প্রভাময়ী।'

শেখর বিয়েতে কিছু নেবে না বলেছে। কিন্তু আসলে সে যা নেবার নগদই নিয়ে গেল। সেটা হ'ল পণ্ডিত মশাই ও প্রভাময়ীর বুকের উজাড় করা আশীর্বাদ আর দু' ফোঁটা আনন্দাশ্রু।

শিক্ষক ও ছাত্র, গুরু ও শিষ্য, পিতা ও পুত্র—সমান। শেখরও পুত্রের কর্তব্যই করে গেল বৈকি!

সেদিন রাত্রে মমতার কাছে কিছু প্রকাশ করলে না শেখর। মমতার প্রশ্নের জবাবে শুধু হতাশ ভাবে বললে—কই, তেমন মেয়ের সন্ধানই তো পাচ্ছি না। তাড়াহুড়া করে, একটা যা তা করলে তো চলবে না। সারাজীবনের ব্যাপার। বুঝলে হে, একটু ভেবে-চিন্তে এগোতে হবে।

মমতা মুখ ভার করে বললে—তা তোমার এই ভেবে আর চিন্তেটা কবে পর্যন্ত শেষ হবে?

শেখর বেশ গম্ভীর ভাবে বললে—বুঝলে এসব হ'ল প্রজাপতির নির্বন্ধ। কথায়ই আছে—। আচ্ছা শোনো, বিয়েটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কথাটা হ'ল—

কিন্তু শেখরের বৈবাহিক ব্যাখ্যা সুরু হবার আগেই মমতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পরদিন যথাসময় মেয়ে আশীর্বাদ করবার জন্যে শেখর পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে গেলেন—পুরুত ঠাকুর আর সেই ঘটক মশাই।

এদিকে যথাযথ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি প্রভাময়ী যোগাড় করেই রেখেছিলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। অতএব করবার মত কিছু না থাকলেও, পণ্ডিত মশায়ের ছুটোছুটির বিরাম ছিল না। একবার ঘর একবার বার, আর হাঁক ডাকের মধ্য দিয়েই তাঁর অহেতুক ব্যস্ততা প্রকাশ করছিলেন।

যথারীতি আশীর্বাদ করে শেখর অনুর হাতে এক জোড়া বালা দিল। অনুর কাছে দাঁড়ানো, অনুর বান্ধবী মানসী, তা অনুর হাতে পরিয়ে দিল। অনু পর্যায়ক্রমে শেখর থেকে আরম্ভ করে, গুরুজনদের প্রণাম করল। সব শেষে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম করতেই কেন জানি না, পণ্ডিত মশায়ের দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে প'ড়ল। এমন সময় মানসী জোরে শাঁখ বাজিয়ে উঠতেই, পণ্ডিত মশাই কী যে বললেন—তা বোঝা গেল না। দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানো প্রভাময়ী শুধু বার বার বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে লাগলেন।

বাড়ী ফিরে গম্ভীর ভাবে পকেট থেকে একটুকরা কাগজ বের করে, মমতার হাতে দিয়ে বললে শেখর—এই নাও, তোমার ঠাকুরপোর বউ।

তারপর মমতার অবাক দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে—আহা-হা, দেখই-না কেমন মুক্তোর মত দেখতে?

মমতা পড়ে দেখল, লেখা আছে—শ্রীমতী অনুসূয়া ভট্টাচার্য। তার নীচে পণ্ডিত মশায়ের নাম ঠিকানা।

অর্থাৎ আসবার সময় অনুসূয়াকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছিল শেখর, মমতাকে দেখাবার জন্যে।

মমতা বললে—মানে ?

শেখর বললে—মানে ঠিক ঐ রকমই দেখতে, শুনতে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে।

মমতা বললে—সত্যি ?

শেখর সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—এই আসছে সতরই মাঘ, সন্ধ্যা সাতটা চব্বিশ মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড গতে, বিয়ের লগন।

মমতা বায়না ধরে বসলে—বল না গো সত্যি করে !

শেখর বললে—তুমি তো ভাবো আমি বুঝি চোখ কান বুঁজেই থাকি। এবার দেখলে তো, আমার সবদিকে কেমন লক্ষ্য আছে ?

মমতা বললে—সে কথা কি না বলেছি ? তা দেখতে কেমন ?

শেখর বললে—ঠিক ঐ হাতের লেখার মত। ব্যস্, এবার লেগে যাও আয়োজন করতে। হ্যাঁ—ভাল কথা, কাল কিন্তু খোকাকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

তারপর মমতার আগ্রহাতিশয্যে, সবিস্তারে সব বললে শেখর।

মমতা অভিমান করে বললে—তা আমাকে গোপন করেছিলে কেন ?

শেখর বললে—তোমাকে চমকে দেবার জন্যে। বলে হাসতে লাগল শেখর।

পরদিন সকাল বেলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাবার জন্যে গালে সাবান মাখতে গিয়ে সরিৎ হঠাৎ আবিষ্কার করল, যে গোঁফটার দুই দিকের সীমানা ঠিক নেই। তাই দাড়ি কামানো মুলতবী রেখে, একাগ্র হ'য়ে গুম্ফ চর্চায় মন দিল। এমন সময় কানের কাছে শুনল—বিয়ে।

মুঠো মুঠো আশা

এঁ্যা—! বলে সরিৎ এমন ভাবে চমকে উঠল যে, রেজরের টানে গোঁফের একদিকটার খানিকটা বেখাপ্‌পা মত উঠেই গেল, ফিরে তাকিয়ে দেখে, মমতা মিটি মিটি হাসছে।

সরিৎ বললে—কার ?

সরিতের গোঁফের এরকম কাহিল অবস্থা দেখে, খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল মমতা। বললে—তার আগে গোঁফটার একটা সুব্যবস্থা করো। আহা-হা, বেচারীকে দেখলে বড় দুঃখ হয়, যেন ল্যাজ কাটা টিকটিকি !

সরিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললে—তাও তো তোমার জন্যেই হ'ল ! গুম্ফ-চর্চা একটা সোজা কর্ম নয়। রীতিমত একটা সূক্ষ্মশিল্প। যাকে বলে ফাইন্ আর্ট। তা কানের কাছে অমন ঘ্যানর ঘ্যানর করলে গোঁফ তো গোঁফ, মুণ্ডুটা যে—কথাটা শেষ না করেই সরিৎ আয়নার দিকে তাকিয়ে গোঁফের দুই দিকের সমতা আনতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বানরের পিঠে ভাগের মত, একদিকটা সব সময় বড়ই থেকে যেতে লাগল। গোঁফ যেন সরিতের সঙ্গে একটা কৌতুক আরম্ভ করে দিল। অবশেষে নাজেহাল হ'য়ে, দুত্তোর বলে, রেজরের একটানে সমূলে উৎখাত করে দিয়ে, গোঁফহীন হ'য়ে গেল সরিৎ। তারপর রেগে গিয়ে বৌদির দিকে ফিরে বললে—নাও, এবার হ'ল তো ?

মমতা বললে—বিয়ের আগে গোঁফহীন হওয়াটা কিন্তু খুবই শুভ লক্ষণ। আজকালকার মেয়েরা গোঁফকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

সরিৎ বিরক্ত হ'য়ে বললে—কার বিয়ে,তা বলছ না—শুধু শুধু—।

মমতা বললে—কার আবার, তোমার।

তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললে সরিৎ—মানে ?

মমতা বললে—মানে, আসছে সতরই মাঘ, সন্ধ্যা সাতটা চব্বিশ মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড গতে—বিয়ের লগন।

সরিৎ তড়িৎ গতিতে আয়নার দিকে ঘুরে গালে দ্রুত সাবান মাখা ব্রুশটা ঘষতে ঘষতে বললে—হবে না—হবে না—কিছুতেই হবে না।

মমতা বললে—হবেনাটা কি শুনি ?

সরিৎ তেমনি ভাবে বললে—ঐ বিয়ে-টিয়ে আমার দ্বারা হবে না বাপু।

মমতা বললে—সেকি! তোমার বিয়ে কি তবে ওপাড়ার গদাইকে দিয়ে হবে নাকি?

সরিৎ বললে—বরং তাকে দিয়েই একবার চেষ্টা করে দেখ। মোদ্দা আমার দ্বারা ওসব কিছু হবে-টবে না এ আমি স্রেফ্ বলে দিলুম।

মমতা বললে—আর নিজে কী করবে?

মমতার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সরিৎ বললে—আমি! কিছুই না, বেশ আছি, দিব্যি আছি। দেখো সংসারে শুধু সং সাজাই সার, এটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি। আর এই জন্যেই আমার বন্ধু অনিমেষ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে।

মমতা বললে—তাই বুঝি তুমিও ষাঁড়ের মত হাটে মাঠে ঘুরে বেড়াবার মতলব করেছ?

সরিৎ বললে—তার মানে?

মমতা বললে—তার মানে, মেয়েদের যেমন ধিঙ্গী হ'লে ঘরে রাখতে নেই, দোসর জুটিয়ে দিতে হয়, ছেলেদের বেলায়ও ঠিক তাই। ঢেঙা হ'লেই গলায় দড়ি পরিয়ে দিতে হয়, যাতে এদিক ওদিক আর চোখ ফেরাতে না পারে।

সরিৎ বললে—দড়ি পরাও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি নির্ঘাত দড়ি ছিঁড়ে পালাব, এই আমি বলে রাখছি।

মমতা বললে—আমরাও গরু খোঁজা করে আবার তোমাকে ধরে নিয়ে আসব।

সরিৎ এবার হাত জোড় করে বললে—দোহাই তোমার, আমি হার মানছি। তোমার জিভের ডগায় দুষ্ট সরস্বতীর বাসা। তোমার সঙ্গে পারব, এমন সাধ্যি নেই। শুধু আমার অনুরোধ, এখুনি আমাকে ঘানির গাছে জুড়ে দিও না।

মমতা বললে—জুড়ে কি আর সাধে দিতে চাই বাপু। তোমার অবস্থা দেখে যে আমার কান্না পেয়ে গেছিল।

সরিৎ অবাক হয়ে বললে—কান্না পেয়ে গেছিল! কী অবস্থাটা আমার দেখলে শুনি?

মমতা বললে—এই বেশী কিছু না, ক্ষুধামান্দ্য, রাতে তোমার অনিদ্রা। বিছানায় এপাশ ওপাশ, তারপর পদ্মাসনে বসে, একটানা হাই তোলা। এইসব লক্ষণ দেখেই তো, আমি তোমার দাদার কাছে গিয়ে একেবারে কেঁদে পড়লাম।

সরিৎ চোখ কপালে তুলে বললে—কেঁদে পড়লে! দাদার কাছে!

মমতা বললে—হুঁ, তবে আর কার কাছে যাব বলো?

সরিৎ বললে—কেঁদে গিয়ে কি বললে?

মমতা বললে—বললাম, ওগো আমাদের বুঝি সর্বনাশ হ'য়ে গেল গো। তোমার দাদা, সবেমাত্র ঘুমোবার আয়োজন করছিলেন, অমনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। তারপর তোমার লক্ষণগুলো যথাযথ বলে গেলাম। আর তিনি পরদিনই ছুটলেন, ঘটক মশায়ের কাছে। ঘটক মশাই নিয়ে গেলেন বাগবাজার।

সরিৎ যদিও এতক্ষণ মমতার কথাগুলোকে কল্পিত কাহিনী বলেই মনে করছিল তথাপি তার মনটা যেন কেন অকারণ শিহরণে বার বার কেঁপে উঠতে লাগল। হয়তো তার সচেতন মন যখন প্রতিবাদ করছিল, তখন তার অবচেতন মন তার কানে কানে বলছিল—, না—না—প্রতিবাদ ক'র না, এই তো সময়। যৌবনের সঙ্গে যৌবনের মিলনের এই তো শুভক্ষণ! তুমি কি জান না নদীতে যেমন আছে জোয়ারের আবেগ তেমনি আছে ভাঁটার টান?

সরিৎ একটু হেসে বললে—যাও, যত সব বাজে কথা!

এমন সময় শেখর এসে বললে—খোকা, আজ অফিস থাকে সোজা বাড়ি আসবি।

অন্য সময় হলে এককথায় সরিৎ ঘাড় কাৎ করে সম্মতি দিত। আজ কিন্তু তার একটা কৌতূহল জাগল—।

শেখর ভেবেছিল, মমতা বোধহয় এতক্ষণে সরিৎকে সব কথা

LIBRARY 47172 2.8.67

বলে থাকবে। তাই সে বললে—ওবাড়ি থেকে আজ তোকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

সমস্ত রক্ত যেন সরিতের গাল হুটোয় এসে জমা হ'ল। সে কোনোমতে বলে ফেললে—আচ্ছা।

কিন্তু পরক্ষণেই মমতার হুষ্টুমী ভরা হাসি-মুখের দিকে চেয়ে, সে বলে উঠল—তা আমি বলছিলাম কি দাদা—

কিন্তু বলতে পারল না। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আঃ, বলনা বৌদি একটু দাদাকে।

শেখর সরিতের অসমাপ্ত কথাটাব অর্থ বুঝতে না পেরে মমতাকেই জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার— ?

মমতা গম্ভীর ভাবে বললে—ঠাকুরপো বলছিল,—ঠাকুরপো বলছিল, ওর নাকি একটা তানপুরার শখ।

তাজ্‌জব বনে গেল সরিৎ। একথা আবার সে কখন বলল! অবাক হ'ল শেখরও। বললে—তানপুরা! কেন খোকা কি গান গাইতে পারে নাকি ?

মমতা আড় চোখে একবার সরিৎকে দেখে নিয়ে বললে—পারে না, তবে শিখবে।

সরিতের অবস্থাটা অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠল।

শেখর বললে—তা বেশ তো. একটা কিনে দিলেই হবে। কত আর দাম! কিন্তু তাই বলে ওঁদের কাছে একটা তানপুরা আমি যৌতুক চাইতে পারব না।

তারপর সশ্রদ্ধকণ্ঠে শেখর বললে—জানো মমতা, ছেলেবেলায় বাগবাজারে মামাবাড়ী থেকে যখন ভবতারিণী বিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন আমার কান হু'টো এই পণ্ডিত মশায়ের কাছে, একদম বিনাশর্তে বাঁধা ছিল। আর কান হু'টো বাঁধা দিয়ে, যে প্রাণের মূল্যটা পেয়েছি, সেই ঋণ তো আর শোধ দেওয়া যাবে না। শুধু এই ফাঁকে কিছুটা সুদ দেবার সুযোগ হ'ল মাত্র।

মমতা বললে—তা তুমি সুদ দিয়ে ধন্য হবার লোভেই কি—

শেখর বলে উঠল—না—না, আগে এনে তো দিই, তারপর দেখবে, আমাদের ঘর আলো করে কিনা!

তারপর সরিৎকে লক্ষ্য করে বললে—আচ্ছা, বিকেলে তুই বাড়ি থাকিস কিন্তু খোকা। বলে চলে গেল শেখর।

মমতা মুখভার করে বললে—শুনলে ঠাকুরপো, শুনলে! আর আমি বুঝি তোম্যাদের ঘর অন্ধকার করেই বসে আছি!

সরিৎ বললে—তোমাকে যে অন্ধকার বলে, সে নিজে একটি অন্ধ। সে কথা যাক। কিন্তু এ তুমি কি করলে বৌদি? দাদা ভাবলেন সত্যি সত্যিই বুঝি আমি একটা তানপুরা চেয়ে বসে আছি। একে তো, কোথায় কী ব্যাপার, কিছুই জানি না, তাছাড়া আমার এই হেঁড়ে গলায় কি গান গাইতে পারি—না কোনোদিন গাইতে পারব? সত্যিই তো ওঁরা যখন দিতে পারছেন না, তখন—

কথাটা টেনে নিয়ে মমতা বললে—আর যখন আলো ঝল্‌মল্‌ করা পাত্রীটি—।

আবার সেই শিহরণ, আবার সেই চাঞ্চল্য। সরিৎ বলে ফেললে—হ্যাঁ, তাই।

তারপরই কথাটা ঘোরাবার জন্যে তৎপরতার সঙ্গে বললে—না—না—মানে—

মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললে মমতা—তা আমি বুঝতে পেরেছি।

সরিৎ ধরা পড়ে গিয়ে রেগে গেল। বললে—কী—কী বুঝতে পেরেছ—?

মমতা বললে—তোমার এই গাঁইগুঁই সব ফক্কিকারের ব্যাপার।

সরিৎ বললে—তার মানে—?

মমতা বললে—বলি, আমার কাছে তো খুব লম্ফঝম্ফ করা হচ্ছিল, আর দাদার কাছে অমনি সুবোধ ছেলে হয়ে গেলে?

সরিৎ বললে—তা দাদার মুখের উপর—

মমতা বললে—থামো মশাই থামো। যে বেড়ালটা ইঁদুর মারে, তার গোঁফটা দেখলেই চেনা যায়। ও আমরা মুখ দেখলেই

বুঝতে পারি। তোমার এই বিরাগ দেখে, আমরাও যদি তোমাকে বৈরাগী করে দিতাম, তবে নিশ্চয় জানি, তুমিও ছোট ছেলেদের মত দেয়ালের গায়ে লিখে দিতে—'আরএকবার সাধিলেই বিবাহ করিব।'

সরিৎ বললে—দেখো,একবার আমি যদি সংকল্প দৃঢ় করে ফেলি—

মমতা হেসে বললে—তবে আর তা ঢিলে করা যাবে না—এই তো?

সরিৎ দৃঢ়ভাবে বললে—ঠিক, তাই।

মমতা বললে—কিন্তু মেয়েটি শুনেছি খু—উ—ব—সুন্দরী!

সরিৎ বললে—সুন্দরী না হাতী! তোমার মত?

মমতা বললে—আমার চেয়েও—। আমি তো তার কাছে পেঁচী গো পেঁচী। সে নাকি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তার হাতের লেখা দেখবে? কী সুন্দর! যেন মুক্তো বসানো!

আর একটু হ'লেই বৌদির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি! তার মনের চঞ্চলতাটা পাছে বৌদির দৃষ্টিগোচর হ'য়ে যায়, সেই ভয়ে সরিৎ আয়নার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—আমার দেখার সময় নেই।

বলে গালে সাবান মাখতে সুরু করলে। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাতটা তার এমন কাঁপতে লাগল কেন? গালে সাবান মাখতে গিয়ে কপালে দু'একবার ব্রুশটা ঠেকে গেল কেন?

সরিৎ ব্রুশটা রেখে রেজরটা নিয়ে দাড়ি কামাবার চেষ্টা করতে লাগল। বললে—ইস্, আমার অফিসের বেলা হ'য়ে গেল!

কিন্তু যতবারই চেষ্টা করতে লাগল ততবারই রেজরটা ঠিক মত ধরতে পারছিল না সরিৎ।

মমতা বললে—আহা-হা, দেখই না একবার চেয়ে। এতে এমন কিছু আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বলে কাগজটা আর একটু এগিয়ে ধরল সরিতের সামনে।

হঠাৎ একটা বেয়াড়া পোঁচ লেগে, সরিতের গালটা গেল একটু কেটে। সরিৎ কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে চেয়ে ধরে বললে—এঃ হেঃ হেঃ—গেল তো গালটা কেটে—!

মমতা হেসে বললে—আচ্ছা—আচ্ছা, দেখো বাপু, নাক কান কেটে আমাদের আর মুখ হাসিও না যেন। এই রইল পাশে। সময় হ'লে দেখে নিও। আমি চললাম। বলে চেয়ারের উপর কাগজখানা রেখে মমতা চলে গেল।

সরিৎ একমনে তেমনি দাড়ি কামাবার নামে অভিনয় করতে লাগল। একটু বাদে বৌদি চলে গেছে কিনা চেয়ে দেখল। চারিদিকটায় একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তারপর আস্তে আস্তে কাগজখানা তুলে নিয়ে, চেয়ারে বসে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল লেখাটার দিকে। তারপর আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বের হ'য়ে গেল—অনুসূয়া—।

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সরিতের কানত্নটো গরম হ'য়ে উঠল।

এদিকে সরিৎ যখন তন্ময় হ'য়ে কাগজটায় লেখা, গুটিকয়েক অক্ষর দেখছিল—, ওদিকে তখন পর্দার আড়াল থেকে, ত্ন'টো চোখ তাকে গভীর ভাবে লক্ষ্য করছিল।

—ঠাকুর পো—।

হঠাৎ চমকে উঠল সরিৎ। এবং চট্ করে কাগজখানাকে জামার পকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্রুশটা গালে মাখতে লাগল।

মমতা যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললে—সেই কাগজখানা দাও তো। তোমার দাদা চাইলেন।

সরিৎ নিস্পৃহ ভাবে বললে—ঐ দেখ, সেই জায়গায়ই পড়ে আছে!

মমতা বললে— কই দেখছি না তো?

সরিৎ বললে—তাহলে বোধহয় কোথও উড়ে ফুড়ে গিয়ে থাকবে। খুঁজে দেখ। আর না হ'লে, বিন্দু যখন ঘর ঝাঁট দেবে, তখন বেরুবে।

মমতা অতিকষ্টে হাসি চেপে বললে—আচ্ছা, তাই হবে। তবে কাগজখানা ঝাঁট দেবার সময় পেলে হয়। কি জানি, কোথায় গিয়ে উড়ে পড়লো! কারো জামার পকেটে-টকেটে গিয়ে পড়লে তো পাবারই আশা নেই।

এমন সময় শেখর ডেকে বললে—কই গো, অফিসের বেলা হ'য়ে গেল।

মমতা সরিৎকে বললে—আচ্ছা চলি। ওদিকে অফিসের বেলা হ'য়ে গেল—মনে রেখো।

সরিৎ বললে—সে আমার খেয়াল আছে।

—খেয়াল থাকলেই বাঁচি। বলে হেসে মমতা চলে গেল।

বৌদি চ'লে যেতেই, সরিৎ কাগজখানা পকেট থেকে বের করে, আবার দেখতে বসল। মনে মনে নামটা বার কয়েক পড়ল। ক্রমে অক্ষরগুলো যেন একটি মূর্তি ধরে সরিতের চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। মগ্ন হয়ে সে তার কল্পনার সুন্দরীকে দেখতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ তার ধ্যান ভেঙে গেল। ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, চেঁচাতে চেঁচাতে এসে উপস্থিত হ'ল টুটুল। বললে—ছোড়দা—ছোড়দা—

সরিৎ কাগজখানা পকেটে লুকিয়ে রেখে বললে—কী—কী—

টুটুল তেমনি ভাবে বললে—তোমার নাকি—বি—বি—

পাদপূরণ করে দিয়ে বললে সরিৎ—য়ে—?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ বিয়ে?

সরিৎ বললে—ধ্যেৎ, কে বললে রে?

টুটুল বললে—হুঁ, আমি বুঝি আর জানিনা ভেবেছ? বৌদি যে আমাকে বললেন—

আগ্রহের সঙ্গে সরিৎ বললে—কী—কী বললেন রে—?

টুটুল বললে—আমি তো দিন রাত্তির পাড়া বেড়াই কিনা। তাই বৌদি বললেন কি—টুটুল—, তোর সঙ্গে আমি তো আর পেরে উঠছি না। এবার আসুক তোর নতুন বৌদি, দেবে তোর ঠ্যাং দুটো ভেঙে।

তারপর আতঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ দাদা, সত্যিই ভেঙে দেবে?

ঘড়ির দিকে চেয়ে লাফিয়ে উঠল সরিৎ। এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট দাড়িটুকু রেজরের কয়েকটা টানে গাল থেকে মুক্ত

করতে করতে বললে—হুঁ, তোর ঠ্যাং ভাঙতেই তো তিনি আসছেন রে!

টুটুল ঠোঁট উলটে বললে—ইস্, ঠ্যাং আমার পাবে কোথায় শুনি? ধরতে এলেই ঠ্যাং হু'টো নিয়ে এমন ছুট্ দেব না! হুঁ—

সরিৎ বললে—ব্যস্, তাহ'লে আর কি!

টুটুল বললে—হ্যাঁ ছোড়দা, পাকা দেখা কাকে ব'লে?

সরিৎ রেজর, ব্রাশ প্রভৃতি ধুয়ে মুছে রাখতে রাখতে বললে —পাকা দেখা?

টুটুল বললে—হ্যাঁ! বল না!

সরিৎ তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে বললে—কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবার কথা শুনেছিস?

টুটুল—হ্যাঁ, বৌদি আমাকে বলেন যে? সরিৎ চলে যায় দেখে টুটুল বললে—ও ছোড়দা—বললে না?

সরিৎ বললে—অফিস থেকে আসি, তোর পিঠের উপর দেখিয়ে দেব—। বলে সরিৎ চলে গেল।

'পাকা দেখা'র অর্থটা টুটুলের কাছে আর পরিষ্কার হ'ল না।

অনুসূয়া বড়ই বিপদে পড়ে গেল। হ্যাঁ, বিপদ বৈকি! বেশ ছিল সহপাঠিনীদের সঙ্গে হেসে খেলে। দিনটা কাটাতে তার খুব কষ্ট হ'ত না। স্কুল, বাড়ী, সহপাঠিনীদের সঙ্গে গল্প, আর ঘরের কাজে মা'কে একটু আধটু সাহায্য করা। ব্যস্।

মাঝে মাঝে মনটা যে তার খারাপ হ'ত না তা নয়, সংসারের অভাব অনটন আর তাকে নিয়ে বাপ মায়ের হুশ্চিন্তা, এসব তাকে স্পর্শ করত। কিন্তু বয়সের একটা স্বাভাবিক উচ্ছলতা আছে, একটা উজ্জ্বল প্রাণ-চাঞ্চল্য আছে, আছে তারুণ্যের আরণ্যিক উদার শ্যামল সজীবতা।

অতএব সংসারের প্রতিকূল পরিবেশ, মনে ক্ষণিকের জন্যে মেঘের

সঞ্চার করলেও, যৌবনের পাগলা হাওয়া তাকে মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যেত।

কিন্তু একি হ'ল! সংসারের কাজে তো বটেই, নিজের পড়াশুনা, গল্প গুজবের ফাঁকেও, থেকে থেকে আনমনা হ'য়ে যেতে লাগল। এক এক সময় মনে হয়,—ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, একা একা বসে থাকে। এক এক সময় কিছুই ভাল লাগে না, আবার মনে হয়, সবাইকে জড় করে, বসে গল্প করে, এমন কি বাড়ীওয়ালার বিধবা বউ চণ্ডী মাসী—যাকে অনুসূয়া দু'চোখে দেখতে পারে না, তার সঙ্গেও দুটো কথা বলতে ইচ্ছা করে। মনের এই বিচিত্র খামখেয়ালীপনায় অনুসূয়া অস্থির হ'য়ে উঠল।

বিপদটা আরো বাড়ল, কাল বিকেলে পণ্ডিত মশাই সরিৎকে আশীর্বাদ করে আসবার পর থেকে।

সরিৎ নামটা কাল রাতেই পণ্ডিত মশায়ের মুখ থেকে শুনেছে। বাবা মাকে বলেছিলেন—সরিৎকে আশীর্বাদ করে এলাম।

ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। আর কিছু শুনবার সুযোগ হ'ল না অনুসূয়ার। প্রভাময়ীর প্রশ্নের জবাবে, পণ্ডিত মশাই শুধু বললেন—ফিরে এসে সব বলব। বলেই তিনি তাড়াতাড়ি টিউশনীতে বেরিয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন, তখন অনুসূয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব বাবা ও মা কী আলোচনা করেছেন, তা শুনবার সুবিধা হয়নি অনুর। একমাত্র কিছু জানবার উপায় হ'ল পিণ্টুর কাছ থেকে। পিণ্টু বাবার সঙ্গে কাল ঐ বাড়ীতে গিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যায় বটে। কিন্তু কাল রাত থেকে আজ সারা দিন, একবারও তাকে নিরালায় পাওয়া গেল না। তা ছাড়া যে দুষ্টু!—বলবে কি? দেখা যাক চেষ্টা করে!

তাই বিকেলে পিণ্টু স্কুল থেকে ফিরে আসবার জন্যে অনুসূয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল। এই সময়টাই যা একটু নিরিবিলি! মা থাকেন কলতলায় ব্যস্ত। বাবা ফিরতে সেই পাঁচটা—। অতএব এই ফাঁকে যদি পিণ্টুটাকে ধরা যায়। কিন্তু

স্কুল থেকেই যদি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে চলে যায়, বা পথে দেরী করে! নাঃ কোনাদিন তো করে না, এখন যদি করে বসে! পাগল ছেলে! কখন কি মতি হয় কে জানে! তবে এখন যদি একবার আসে, তবে পিণ্টুকে ধরে, সে কথা আদায় করবেই। কারণ পিণ্টুকে বশ করবার কায়দা অনুর জানা আছে। আর তার উপকরণও সে যোগাড় করে রেখেছে। কি করা যায়! যে দেবতা যাতে তুষ্ট—তাকে তো সেই উপাচার দিতেই হবে!

বিকেল চারটা বাজল। সাড়ে চারটা হ'ল।

নাঃ—ঐতো এসেছে! ঐ যে পিণ্টুর গলা শোনা যাচ্ছে! সে তার খেলার সাথী ভোলাকে ডেকে বলছে—ভোলা, আমি বই রেখে এক্ষুণি আসছি, তুই বলটা বের করে রাস্তায় দাঁড়া। অনুসূয়া তৈরী হ'য়ে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল।

হৈ হৈ করে এসে উপস্থিত হ'ল পিণ্টু,—এসেই দিদিকে সামনে পেয়ে, তার হাতে বই খাতা দিয়ে বললে—দিদি, কিছু খেতে দে শীগ্‌গির।

অনুসূয়া বললে—দিচ্ছি, আগে হাত পাটা ধু'য়ে নে।

পিণ্টু বললে—ও আমি স্কুল থেকেই ধু'য়ে এসেছি।

অনুসূয়া দরদের সঙ্গে বললে—তা হ'লেও রাস্তা দিয়ে এসেছ তো, ধুয়ে নাও।

পিণ্টু অসহিষ্ণু ভাবে বললে—ওঃ দেরী হয়ে যাবে!

অনুসূয়া বললে—তোর আর ভেতরে যেতে হবে না। ঐ দ্যাখ, দাওয়ার উপর বালতিতে জল রেখেছি, আর এই দ্যাখ, তোর খাবার নিয়ে আমি দাঁড়িয়েই আছি।

পিণ্টু অবাক হ'য়ে বললে—তাই না কি?

অনুসূয়া বললে—আমি তো জানি, এসেই তুই খেলতে যাবি।

পিণ্টু খুশি হয়ে বললে—তুই কি ভালরে দিদি!

হঠাৎ আজকেই বা পিণ্টুর জন্যে দিদি এত সুব্যবস্থা করে

রেখেছে কেন? পিণ্টু তা অত তলিয়ে দেখল না। নগদ লাভটা পেয়েই সে খুশি।

পিণ্টু তাড়াতাড়ি বালতি থেকে ঝপ্ ঝপ্ করে খানিকটা জল হাতে পায়ে ঢেলে—অনুসূয়ার হাত থেকে রুটি আর গুড়টুকু নিয়ে পাটিসাপটা পিঠের মত পাকিয়ে যথাসম্ভব মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে লাগল।

ওদিকে বাইরে থেকে ভোলা ডাক দিল—পিণ্টু রে—।

পিণ্টুর মুখের অবস্থা তখন জবাব দেবার মত নয়। চোখ দুটো তার বড় হয়ে উঠেছে। মুখের ভেতরের রুটির দলাটা দ্রুত পার্শ্ব পরিবর্তন করতে লাগল এবং যে পাশে যাচ্ছে সেইদিকের গালটা অসম্ভব রকম উঁচু হয়ে ফুলে উঠতে লাগল। কিন্তু তবুও ঐ অবস্থায়ই ভোলাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে—আসৃছি রে—, বলতে গিয়ে একটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে উঠল।

অনুসূয়া বললে—আস্তে আস্তে খা, গলায় বেধে গিয়ে বিষম খাবি যে!

তিন গ্রাসে রুটি ক'খানা সাবাড় করে, অনুসূয়ার হাত থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল।

অনুসূয়া দেখল, হাতের শিকার তো এক্ষুণি ফস্কে পালাবে। অতএব অনুসূয়া এবার তার দ্বিতীয় অস্ত্র প্রয়োগ করল। অনুসূয়া বললে—ছাখ্, তোর জন্যে কি রেখেছি পিণ্টু!

দিদির হাতের দিকে তাকিয়েই পিণ্টুর চোখ দুটো লোলুপ হয়ে উঠল। আধপাকা একটা সুডৌল পেয়ারা। অন্ততঃ দেড়পো ওজন হবে। পেয়ারার প্রতি পিণ্টুর আবার অত্যধিক দুর্বলতা ছিল। পিণ্টু বললে—কোথায় পেলি রে দিদি?

অনুসূয়া বললে—কোথায় আর পাব। কিনেছি।

পিণ্টু বললে—দে-না রে?

অনুসূয়া বললে—দেব, আগে আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার জবাব দিবি বল্?

পিণ্টু ঘাড় কাৎ করে বললে—হুঁ, দেব।

অনুসূয়া বললে—তবে বস্ এখানে।

পিণ্টু দাওয়ার উপর বসল। অনুসূয়াও তার গা ঘেঁষে বসে পেয়ারাটা তার হাতে দিতেই পিণ্টু তাতে একটা কামড় দিয়ে বললে —এঃ কি ভাল! যেন গুড়ের মত!

অনুসূয়া একবার চিন্তা করল—কিভাবে কথাটা আরম্ভ করা যায়। তারপর বললে—আচ্ছা শোন্, তুই তো বাবার সঙ্গে সেখানে গেলি, কেমন?

পিণ্টু চোখ নিমীলিত করে পেয়ারা চর্বণসুখ উপভোগ করতে করতে বললে—হুঁ।

অনুসূয়া বললে—গিয়ে কী দেখলি?

পিণ্টু বললে—কোথায় গিয়ে?

অনুসূয়া বললে—ঐ যে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট না কোথায় গেলি?

পিণ্টু বললে—ওঃ তোর শ্বশুর বাড়ী?

চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল অনুসূয়ার। পিণ্টুকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বললে—যাঃ! আচ্ছা তুই তো সেখানে গেলি?

পিণ্টু বললে—হুঁ, গেলাম।

অনুসূয়া বললে—আচ্ছা, গিয়ে কি দেখলি—?

পিণ্টু পেয়ারার চর্বিত অংশ গলাধঃকরণ করে বললে—

দেখলাম, বেশ একটা হলদে রংয়ের বাড়ী। তা আমাদের এই বাড়ী থেকে অনেক—অনেক—

বাধা দিয়ে বললে অনুসূয়া—আঃ, আমি তা বলছি না। ধর তুই তো গিয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলি?

পিণ্টু বললে—হুঁ, গেলাম। গিয়ে টুটুলের সঙ্গে—ওঃ তুই তো আবার টুটুলকে চিনিস না। খুব ভাল মেয়ে। তার সঙ্গে চোর-পুলিশ খেললাম। তারপর হেসে বললে—বুঝলি দিদি, ওদের বাড়ীতে একটা ঝি আছে। সে সারাক্ষণ একা একা কথা বলে। দেখতে—হ্যাঁ, শাকচুন্নীর মত। আমাদের ঐ চণ্ডী মাসী—ঠিক তার মত দেখতে।

অনুসূয়া বললে—তা তো যেন হ'ল, আর কাকে দেখলি, তাই বল্ না— ?

পিণ্টু আর একটা অংশ মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললে—টুটুলের বৌদিকে দেখলাম। আমাকে আদর করে কত কি খাওয়ালেন। আমি নিচ্চয় করে বলতে পারি দিদি, ওরকম ভাল ভাল খাবার, আমাদের বাড়ীতে কখখোনো হয় নি। টুটুলের কাছে শুনলাম, ওরা নাকি রোজ দুবেলা মাছ খায়! তোর কি ভাগ্য দিদি, তুই তো নিত্যি নিত্যি অমন ভাল খাবার খাবি!

অনুসূয়া বিরক্ত হয়ে বললে—তা তো যেন হ'ল, তা—আর কাউকে দেখলিনি ?

পিণ্টু বললে—হুঁ, দেখলাম।

অনুসূয়া বললে—তাই বল না। বলে ঝুঁকে চেয়ে রইল পিণ্টুর মুখের দিকে। কারণ এক্ষুণি পিণ্টু যার কথা বলবে, তার একটা বর্ণনাও যেন শুনতে ভুল না হয়। অনুসূয়ার মন আর চোখ—দু'টোই উদ্গ্রীব হয়ে উঠল।

পিণ্টু বললে—দেখলাম টুটুলের—বলে পেয়ারার বাকী অংশটুকু মুখে পুরে দিল।

অনুসূয়া ব্যগ্র হ'য়ে বললে—আগে বল্ না। পরে না হয় খাস্।

অনুসূয়ার ব্যস্ততার কারণ—পিণ্টুও যেমন এখুনি পালাবে, তেমনি মাও এদিকে এসে পড়তে পারেন।

পিণ্টু মুখের মধ্যে পেয়ারার অংশটাকে কায়দা করে নিয়ে বললে—দেখলাম টুটুলের—

অনুসূয়া বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বল্ না—

পিণ্টু বললে—দেখলাম টুটুলের বড়দাকে। তিনিও খুব ভাল লোক। ঐ যে আমাদের বাড়ী যিনি এসেছিলেন। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—খোকা তোমার নাম কি? আমিও অমনি বললাম—মাই নেম্ ইজ পিণ্টু কুমার ভট্টাচার্য। আই রীড্ ইন্ ক্লাশ থি।

পেয়ারা খাওয়া শেষ হ'ল পিণ্টুর, অতএব তার কাজও ফুরোল। ওদিকে ভোলা তাগিদ্ দিয়ে ডাকলে—পিণ্টু-রে—এ—।

—যাচ্ছি—ই—ই—বলে এক লাফে পিণ্টু দাওয়া থেকে উঠানে পড়ল।

অনুসূয়া এই আশঙ্কাটা আগেই করেছিল। একটা পেয়ারায় হয়তো পিণ্টুর কাছ থেকে সব কথা আদায় করা যাবে না। তাই সে আর একটা অস্ত্রও যোগাড় করে রেখেছিল। অতএব পলায়মান পিণ্টুর হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বললে—এই দ্যাখ্ তোর জন্যে আরও কি রেখেছি! বলে শাড়ীর আঁচলের তলা থেকে একটা ছোট ঠোঙা বের করে ধরল।

যেতে গিয়ে পিণ্টু থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কী রে?

অনুসূয়া বললে—লজেন্স্।

এতে পিণ্টুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। রেগে গিয়ে বললে—তা এনেছিস তো, অমন লুকিয়ে রেখেছিস কেন? দে না।

অনুসূয়া বললে—দেব, আগে বল্, আর কাকে দেখেছিস?

পিণ্টু ছোঁ মেরে লজেন্সের ঠোঙাটা নিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে বললে—তোর বরকেও দেখেছি।

অনুসূয়ার মুখে য়েন হঠাৎ এক ঝলক রক্ত এসে জমা হ'ল। সে মরিয়া হয়ে ডাক দিল—পিণ্টু—পিণ্টু—শোন্—শোন্—।

পিণ্টু তিন লাফে সদর পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে বললে—আরো লজেন্স্ পেলে—ব—ল—ব—।

চলে গেল পিণ্টু। যার কথা জানবার জন্যে অনুসূয়ার এত প্রতীক্ষা, এত আয়োজন—তার কথা কিছুই শোনা হ'ল না, কিছুই জানা হ'ল না, মাঝখান থেকে তার মনটাকে আরো উদাস করে দিয়ে, তাকে একটা কল্পনার সাগরে ঠেলে ফেলে দিয়ে, পিণ্টু চলে গেল। অনুসূয়া যেন সেই সাগরের মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগল।

সে দেখতে কেমন—। কেমন তার স্বভাব—। রাগী না শান্ত স্বভাবের, গায়ের রং ফর্সা না কালো—। মাথার চুলগুলো

কোঁকড়ানো না সাদাসিধে—। গোঁফ আছে—না কামানো—। হাত পাগুলো সরু সরু—না বেশ জবরদস্ত চেহারার লোক—কত কীই যে জানবার কথা ছিল— !

মা ডাক দিলেন—অনু— ।

চম্‌কে উঠ্‌ল অনুসূয়া। বললে—এই যে মা, আমি এখানে— ।

এতক্ষণে অনুসূয়া নিজেকে আবিষ্কার করল যে, পিণ্টু চলে যাবার পর সে দাওয়া থেকে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর আল্‌না থেকে বাবার একখানা কাপড় কুঁচিয়ে রাখবার জন্যে নামিয়ে অর্ধেকটা কুঁচিয়েও ছিল। বাকীটা মাটিতেই ছড়িয়ে আছে।

একা একা-ই ভারী লজ্জা পেল অনু। যেন নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি কাপড়টা কুঁচিয়ে রাখতে গেল আল্‌নায়। এমন সময় কলরব করতে করতে এসে উপস্থিত হ'ল মানসী ও মল্লিকা—অনুসূয়ার বান্ধবী। মল্লিকার বিয়ে হয় নি। সে কলেজে পড়ছে। মানসীর গত বছর বিয়ে হয়েছে। এসেই দু'জনের মধ্যে কি যেন একটু কৌতুক ইঙ্গিত বিনিময় হ'ল। তারপর মল্লিকা অনুসূয়াকে বললে—দেখে এলাম বাপু তোর হবু বরকে।

অনুসূয়া হেসে বললে—যাঃ, মিছে কথা !

মল্লিকা বললে—মিছে কথা! কেন তোর বরকে কি দেখা যায় না নাকি ?

অনুসূয়া বললে—দেখা যায়, তবে যে-সে দেখতে পায় না।

মানসী বললে—বুঝলি মলি, তপস্যার দরকার।

অনুসূয়া একটু হেসে বললে—মলি কি সেই তপস্যাই করছিস নাকি ?

মল্লিকা ঠোঁট উল্‌টে বললে—রাম বল! ওই হোঁৎকা চেহারার লোকটার জন্যে তপস্যা করতে আমার বয়েই গেছে !

মানসী বললে—হোঁৎকা চেহারা! বলিস কি ?

মল্লিকা বললে—যা সত্যি, তাই বলছি !

মানসী অনুর দিকে আড়চোখে চেয়ে বললে—যাঃ, মিছে কথা বলে অনুর মনটা খারাপ করে দিস নি।

মল্লিকা বললে—কেন ওর কি ধারণা, সে দেখতে একেবারে কার্তিকের মত নাকি ?

মানসী চোখ কপালে তুলে বললে—এমা! কি অলুক্ষণে কথা বলছিস! জানিস, কার্তিকের মোটে বিয়েই হয় নি? বরঞ্চ গণেশের মত বলতে পারিস।

মল্লিকা বললে—না—না—এ যে লোহার কার্তিক গো।

মানসী বললে—সে কি রে!

মল্লিকা বললে—হ্যাঁ, আমার দিদির বাড়ীর কাছেই তো ওদের বাড়ী, তাই কাল ভাবলুম যে যাই দেখি, একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদটা ভঞ্জন করেই আসি।

মানসী বললে—তুই গেলি ?

মল্লিকা বললে—মাইরি বলছি!

মানসী বললে—গিয়ে কী দেখলি ?

মল্লিকা বললে—দেখলাম, লোহার মত মিশমিশে রং, ইয়া এক জোড়া গোঁফ। তুই গালে তুই গালপাট্টা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। দাওয়ায় বসে হুকোয় বট্‌ বট্‌ করে তামাক খাচ্ছে!

মানসী মল্লিকাকে চিম্‌টি কেটে বললে—এঃ হেঃ হেঃ, কেঁচে গেল—কেঁচে গেল। হুকো না—হুকো না, বল্‌ বিড়ি খাচ্ছে—বিড়ি।

মল্লিকা বললে—তাই হবে—বিড়িই বোধ হয়। আমি তো ভাই দেখে, একেবারে ভিরমী খেয়ে পড়লাম।

অনুসূয়া বললে—কী, সেই লোহার কার্তিকের গায়ে ?

মল্লিকা বললে—ওয়াক্‌—ওয়াক্‌—।

মানসী বললে—তবে কি সে দেখতে রাজপুত্তুরের মত নাকি ?

অনুসূয়া বললে—রাজপুত্তুর না হলেও, তার ধার ঘেঁষে যাবে বৈকি!

মল্লিকা বললে—ধার করা রাজপুত্তুর না হলেই বাঁচি!

মানসী বললে—একটা সত্যি কথা বলবি ভাই অনু, তোর তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না?

গাটা যেন কেমন শিউরে উঠল অনুর। সে বললে—তোরও তো বিয়ে হয়েছে, বিয়ের আগে তুই কী করেছিস্?

মানসী বললে—আমি? তবে শোন্—। বলে বেশ গুছিয়ে বসল।

অনুসূয়া ঝুঁকে পড়ল। মল্লিকারও দেখা গেল উৎসাহ কিছু মাত্র কম নয়।

মল্লিকা তাগিদ দিয়ে বললে—নে বাপু, বলবি তো বল্।

মানসী বললে—তোর আগ্রহটাই যেন বেশী দেখছিরে! আচ্ছা শোন্। আমার বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেল। কেউ কাউকে দেখি নি। কিন্তু মনে মনে ভীষণ ইচ্ছে। যাকে বলে উন্মাদ হয়ে গেলাম। ধরলাম ছোড়দাকে চেপে। ত্থ' টি প্. সিনেমার পয়সা ঘুষ দিয়ে রাজী করালাম। ওদিকে তিনিও যে আমার মতই ছট্‌ফট্ করছিলেন, তা কি করে জানব বল্? অতএব ছোড়দার প্রস্তাবে তিনি সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। ঠিক হল, আমাদের বাড়ীর পুব দিকের রাস্তার উপরে লাইট পোস্টের নীচে, বিকেল চারটের সময় যে ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ঘাড় চুলকোতে দেখব, তিনিই হচ্ছেন উনি। আমি তখন কাপড় শুকোরার ছল করে ছাদে উঠে মাথা চুলকোলেই, তিনি আমাকে চিনতে পারবেন।

মল্লিকা বললে—বুদ্ধিটি কার—তোর না তিনির?

মানসী বললে—উঁহু, ছোড়দার। ছোড়দা বললে—পয়সা যেমন খাচ্ছি, কাজও করব তেমনি দেখবি। আমি চারশ বিশ নই জানবি। কিন্তু ছোড়দার উৎসাহটা যেন অধিক মাত্রায় দেখলাম।

অনুসূয়া বললে—কেন?

মানসী বললে—সে কথা পরে বলছি। এদিকে সমস্তই গোপন ব্যবস্থা। বাবা জানলে আর রক্ষে নেই। জানিসই তো বাবা একটু গোঁড়াপন্থী। এদিকে বিকেল আর হ'তে চায় না। আমার

কেবলি মনে হ'তে লাগল, দিনটাকে কে যেন টেনে লম্বা করে দিয়েছে। অবশেষে চারটে বাজল। আমি ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে চেয়ে দেখি, সত্যি সত্যি একটি গোবেচারী গোছের লোক—আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রমাগত ঘাড় চুলকোচ্ছেন।

মল্লিকা বললে—তারপর—তারপর— ?

মানসী বললে—আমার মনে দুষ্টবুদ্ধি জাগল। আমি ছাদে না গিয়ে, ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে তেমনি চেয়ে রইলাম।

অনুসূয়া বললে—কিন্তু সেই ভদ্রলোক— ?

মানসী বললে—এদিকে আমি ছাদে যাচ্ছি না দেখে তিনি ক্রমাগত ঘাড় চুলকেই যাচ্ছেন—চুলকেই যাচ্ছেন। আর তাঁর মুখের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হ'য়ে যাচ্ছে। অবশেষে এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের ধমক খেয়ে, ভদ্রলোকের হুঁশ হ'ল। হতাশ হ'য়ে চ'লে গেলেন।

অনুসূয়া অনুযোগ করে বললে—এ কিন্তু তোর ভারী অন্যায় হ'য়েছে।

মলি বললে—নিশ্চয়ই। হৃদয়েশ্বরের সঙ্গে হৃদয়হীন আচরণ!

মানসী বললে—পরদিন ছোড়দা সেখান থেকে ঘুরে এসেই আমার পিঠের উপর বসিয়ে দিল দুম্ করে এক কিল। বললে—পোড়ারমুখী, ভদ্রলোক চুলকোতে চুলকোতে ঘাড়ে দগ্‌দগে ঘা করে ফেললেন, আর যত সব! এদিকে আমার হেভী লস্ হ'য়ে গেল!

মলি বললে—হেভী লস্ মানে ?

মানসী বললে—তার মানে, তাঁর কাছ থেকেও ছোড়দা তিন ট্রিপ্‌ সিনেমার পয়সা বন্দোবস্ত করে তবে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। সকলেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

এমন সময় বাইরে রিক্‌সার ঠুং ঠুং আওয়াজ হ'তেই হাসি থামিয়ে অনু বললে—এই চুপ্‌, বোধ হয় বাবা এসেছেন। বলেই অনুসূয়া বাইরের দিকে দৌড়ে চলে গেল।

একরাশ জিনিস দু'হাতে আগলে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে নিয়ে

এসে ঢুকলেন পণ্ডিত মশাই। ওদিকে হাত গলিয়ে প্যাকেট থেকে যে দু'চারটে পড়তে পড়তে আসছে, সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। অনুসূয়া সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে এল।

এসেই পণ্ডিত মশাই হাঁক দিলেন—কইগো তোমরা গেলে কোথায় ? তারপর অনুসূয়ার দিকে দৃষ্টি পড়তেই বললেন—এই ছাখ—ছাখ—কত কি এনেছি—। তারপর মানসী ও মল্লিকার দিকে নজর পড়তেই বললেন—এস, তোমরাও দেখ এসে। অনু, তোর মাকে ডাক তো। বলেই দাওয়ার উপর ঝপ্ করে জিনিসগুলো ফেললেন।

বাবাকে রিক্সায় আসতে দেখেই পিণ্টু খেলা ফেলে বাড়ীর দিকে ছুটেছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে এসে ঢুকল—বাবা, আমার জামা প্যাণ্ট এনেছ ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—এনেছি—এনেছি, এই নাও তোমার জামা আর প্যাণ্ট—। বলে জামা প্যাণ্ট পিণ্টুর হাতে দিতেই সে আনন্দে আটখানা হ'য়ে তক্ষুণি ছুটল তার খেলার সাথীদের দেখাতে।

পণ্ডিত মশায়ের গলার আওয়াজ পেয়েই প্রভাময়ী বেরিয়ে এলেন। ধীর ভাবে বললেন—ফর্দমত সব এনেছ তো ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখ না, ফর্দ ছাড়াও দু'একটা জিনিস বেশী না এসে যায় না।

বিপদটাও সেইখানেই। হয় তো প্রয়োজনীয় জিনিস দু'একটা বাদ গিয়েছে, অপ্রয়োজনীয় একগাদা জিনিস এনে হাজির করেছেন। প্রভাময়ী জানতেন বলেই এই প্রশ্ন করেছেন।

পণ্ডিত মশাই তাঁর কর্মপটুতা প্রমাণ করবার জন্যে জিনিসের হিসাব দিতে আরম্ভ করলেন। বললেন—এই দেখ, অনুর শাড়ী, ব্লাউজ, জামাইয়ের গেঞ্জী, আর এই দেখ জোড়ের কেমন সুন্দর কাপড়—এ্যাঁ, কাপড় গেল কোথায় ? তারপর জিনিসপত্রের প্যাকেটগুলো ওলট পালট করতে করতে বললেন—জুতোটাই বা গেল

কোথায়— ? এই রে ! তা বুঝি ঐ রিক্‌সাতেই র'য়ে গেছে ! যাঃ— । বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ।

প্রভাময়ী বলে উঠলেন—সে কি ! তা তুমি বসলে কেন ? যাও—যাও—শীগ্‌গীর যাও । দেখে এস ।

পণ্ডিত মশাই নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন—হুঁ, দেখ গে, এতক্ষণে রিক্‌সাওয়ালা তার নিজের জামাইকেই দিয়ে বসে আছে !

প্রভাময়ী রেগে গিয়ে বললেন—আঃ গিয়ে তো একবার দেখতে পার । আমার হ'য়েছে যত মরণ !

পণ্ডিত মশাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন—যাচ্ছি গো—যাচ্ছি— । বলে ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন ।

বস্তুতঃ এই আত্মভোলা লোকটিকে নিয়ে প্রভাময়ীর অসুবিধার অন্ত নেই । স্কুলের চাকরী ছাড়াও পণ্ডিত মশাই সকাল সন্ধ্যায় টিউশনী করেন । এক কথায় বলতে গেলে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি তাঁর কাজের কোনো বিরাম নেই । কিন্তু যে পরিমাণে তিনি পরিশ্রম করেন, তার অর্ধেক পারিশ্রমিকও ঘরে আসে না ।

প্রভাময়ী রেগে গিয়ে বলেন—তাহ'লে এত পরিশ্রম করে লাভ কি ?

পণ্ডিত মশাই বুঝিয়ে বলেন—আহা-হা—এত পরিশ্রম না করলে ওগুলোর একটাও পাশ করবে না যে ! বুঝলে—এক একটা অকাট মূর্খ । আমার এক এক সময় ইচ্ছে হয় কি জান, ওদের মাথার খুলিগুলো খুলে পরীক্ষা করে দেখতে—ওর মধ্যে সত্যিই কিছু ঘিলু আছে কি না । তবে হ্যাঁ, সবাই যে অকাট তা নয়, ওর মধ্যে দু'একটি রত্নও আছে বৈকি—এই যেমন যে ছেলেটি এবার স্কুল ফাইনাল দেবে—সংস্কৃতে তার—

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায় প্রভাময়ীর । বল্‌লেন—থাক্‌, সে হিসেবে আমার দরকার নেই । আমি জানতে চাই এতগুলো যে টিউশনী করছ, মাস অন্তে কত টাকা ঘরে আনলে ?

পণ্ডিত মশাই আমৃতা আমৃতা করে বললেন—হ্যাঁ তা বটে ।

তবে সব'ই যে দিচ্ছে না, তা তো নয়। এই তো রমেনরা দিয়েছে। বঙ্কুও দি'য়েছে—

প্রভাময়ী বললেন—কিন্তু আমি বলছি যারা দেয়নি বা দেয় না তাদের কথা। তাদের টিউশনী তুমি ছেড়ে দাও।

পণ্ডিত মশাই বললেন—ছেড়ে তো দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাহলে ওদের পাশ করা চলবে না যে!

প্রভাময়ী বললেন—আমাদেরই বা চলবে কি করে?

পণ্ডিত মশাই স্বীকার করে বললেন—তা অবশ্য ঠিক। তবে কি জান?

প্রভাময়ী ঠেস্ দিয়ে বললেন—তা ছাড়া তুমি এমন যুগে জন্মাও নি, যে তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে বিদ্যা দান করে বেড়াবে। তোমার সংসার আছে, ছেলে মেয়ে আছে, তাদের দিকেও তো চাইতে হবে। আর এমন বড়লোকও নও যে বিনা পয়সায়—।

পণ্ডিত মশাই বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আহা-হা, তুমি গোড়াতেই একটা ভুল করে বসলে যে, আরে আমি বড়লোক হলে কি ওরা আমার কাছে আসতে সাহস করত? আমি ওদের সামিল বলেই না ওরা আমার কাছে আশা নিয়ে আসে! ওরা জানে, আমি ওদের দুঃখ বুঝব। না-না, এটা কিন্তু তুমি বড়ই ভুল বলেছ—বড়ই ভুল বলেছ। বলতে বলতে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। তা ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। কারণ সংসার চালান প্রভাময়ী, অতএব তাঁর যত ঝামেলা ঝক্কি পোহাতে হয়; পণ্ডিত মশায়ের তা হয় না, তাই এই সব সমস্যা নিয়ে কোনো কথা উঠলেই তিনি বরাবরই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে থাকেন। এইভাবেই চলে এসেছে প্রভাময়ীর বিবাহিত দিনগুলি।

পণ্ডিত মশাই বাইরে চলে গেলেন রিক্সাওয়ালার খোঁজে। গিয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টি প্রসারিত করে খুঁজতে লাগলেন। অনেক রিক্সা এল, অনেক রিক্সা গেল। ঠুং ঠুং করে নাচতে নাচতে, পণ্ডিত মশাইকে নাচিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তাঁর ঈপ্সিত রিক্সাওয়ালাকে তিনি কোথাও দেখতে পেলেন না। তিনি দু' একজন

রিক্সাওয়ালাকে ডাকলেনও। কিন্তু কাছে আসতেই তিনি বললেন—না-না তুমি নও।

রিক্সাওয়ালাও নাছোড়বান্দা, বললে—কাঁহে বাবুজী, হাম ভি যানে সেকেগা।

অতএব পণ্ডিত মশায়ের তাকে বুঝিয়ে বলতে হল যে, তুমি নও, সে আর একজন।

এতে রিক্সাওয়ালা কী বুঝল তা সে-ই জানে। মাঝখান থেকে বকর বকর করতে করতে সে চলে গেল।

এই রকম জন দুইকে ডেকে পণ্ডিত মশায়ের হুঁশ হ'ল—যে রিক্সাওয়ালা মানেই সেই রিক্সাওয়ালা নয়।

এমন সময় পণ্ডিত মশায়ের স্কুলের একটি প্রাক্তন ছাত্র যাচ্ছিল পথ দিয়ে। পণ্ডিত মশাইকে অমন অনুসন্ধিৎসু অবস্থায় দেখে, এগিয়ে এসে বললে—কী খুঁজছেন স্যার ?

পণ্ডিত মশাই অন্যমনস্কভাবে বললেন—রিক্সাওয়ালা।

ছাত্রটি বললে—আমি ডেকে দেব স্যার ?

পণ্ডিত মশাই যেন অকূলে কূল দেখতে পেলেন, বললেন—তুমি চেন নাকি তাকে ? মানে আমি যে রিক্সাওয়ালাকে খুঁজছি ?

ছাত্রটি বললে—কোন্ রিক্সাওয়ালা স্যার ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আমি যে রিক্সায় এসেছি সেই রিক্সাওয়ালা।

ছাত্রটি সঙ্কুচিত হয়ে বললে—আজ্ঞে না, তাকে আমি চিনি না, আমি অন্য রিক্সা ডেকে দিতে পারি।

পণ্ডিত মশাই বললেন—না বাবা, আমার সেই রিক্সাওয়ালাকেই চাই। বলে পণ্ডিত মশাই এদিক ওদিক দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন।

ছাত্রটি অগত্যা চলে গেল।

এদিকে প্রভাময়ী জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে বললেন—হাঃ ভগবান! তারপর মানসীর হাতে ফর্দখানা দিয়ে বললেন—আয় তো মা, ফর্দটা একবার মিলিয়ে দেখি।

মানসী এক এক করে বলতে লাগল, আর প্রভাময়ী সেগুলো মেলাতে লাগলেন।

মানসী বললে—সিঁদুর, আলতা, আয়না, চিরুনী, স্নো।

প্রভাময়ী সেগুলো আলাদা করে রেখে বললেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মানসী বললে—শাড়ী, ব্লাউজ্।

প্রভাময়ী বললেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

মানসী বললে—জামাইয়ের ধুতি, জামা, জুতো।

প্রভাময়ী সেগুলো স্তূপের মধ্য থেকে বের করে বললেন—এই তো সব আছে। ছ্যাখ্ ছ্যাখ্—সবই আছে আর উনি ছুটলেন কিনা রিক্সাওয়ালার খোঁজে!

এমন সময় হতাশ হয়ে ফিরে এলেন পণ্ডিত মশাই। এবং অপরাধীর মত অসহায় ভাবে বললেন—নাঃ রিক্সাওয়ালার টিকিটিরও দেখা পেলাম না।

প্রভাময়ী ঝামটা মেরে বললেন—তোমার টিকিটি নিয়ে যে ফিরে এসেছ, এই আমার ঢের ভাগ্যি। বলে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন।

মানসী ও মল্লিকা ফিক্ করে হেসে ফেলেই পিছন দিকে মুখ লুকাল।

পণ্ডিত মশাই বুঝতে পারলেন না কিছুই। শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন। অনুসূয়া বাবার হাত ধরে বলল—চল বাবা, ঘরে চল।

আজকার এই প্রাসাদ-নগরীর জনারণ্য দেখে, কলকাতাকে এককালের ঘনারণ্য মাঝে শ্বাপদের চারণভূমি ভাবতে সত্যিই অবাক হতে হয়।

অথচ এককালে তাই ছিল। এখন যেখানে জৌলুসের ছড়াছড়ি, সেই চৌরঙ্গীতেই এককালে বাঘ শিকার করা হয়েছিল। সেটা ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেই।

তখন প্রকৃতি সঞ্জাত বন বীথিকার একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল। তখন উন্মুক্ত আকাশ দিত সূর্যের আলো, দিগন্ত উপহার দিত অফুরন্ত বাতাস, মৌশুমী সিঞ্চন করত ঝর ঝর জল। সেই রাজত্বে বাঘ, ভালুক, হরিণ, সাপ, তাবৎ শ্বাপদ সরীসৃপ নির্ভয়ে বাস করত, আপন মনে হেসে খেলে বেড়াত আপন আলয়ে।

ক্রমে সভ্য মানুষরা এলো সুতীক্ষ্ণ কুঠার নিয়ে, সুকঠিন কুঠারাঘাতে অরণ্য হারাল তার নিজ অধিকার, পালকহীন শ্বাপদ সরীসৃপ দল হল নিস্পন্দ নিথর, ইতিহাসের পাতায় কালো কালো অক্ষরের আড়ালে আশ্রয় নিল অরণ্যরাজ।

সুসভ্য মানুষ, সাথে নিয়ে এল সভ্যতার ছাউনী, তাই দিয়ে ঢেকে ফেল্‌ল উন্মুক্ত আকাশের সূর্যের আলো। নিয়ে এল সভ্যতার প্রাচীর। তাই দিয়ে বন্ধ করে দিল বাতাসের উচ্ছল চলাচল। বিরহ-ক্লিষ্ট মৌশুমী শুধু কেঁদে কেঁদে বলে—'দাও ফিরে সে অরণ্য—'।

কিন্তু সে অরণ্যও আর ফিরে আসবে না, পাওয়া যাবে না ফিরে সেই আলো, সেই বাতাস। এখন এখানে সেখানে আলো বাতাস উন্মুক্ত আকাশের জন্যে সুসভ্য মানুষ শুধু হা হুতাশ করে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এখন দম ভরে বাতাস নিতে, দেহে আলো লাগাতে, অরণ্যের স্নিগ্ধ-শ্যামলিমা দু'চোখ দিয়ে পান করতে, সুসভ্য মানুষ আকুল হয়ে ছোটে নগর ছাড়িয়ে, সভ্যতার ছোঁয়াচ্ এড়িয়ে দূরে—দূরে—বহুদূরে—।

কেন—?

একি সভ্যতার বিষের জ্বালায়—?

তাই হবে বোধ হয়। সভ্যতা বোধ হয় আজ আপন বিষে আপনি জর্জর হয়ে উঠেছে।

সভ্যতা মানুষকে কী দিয়েছে? এক হাতে দিয়েছে সম্পদ-প্রাচুর্য, আর এক হাতে কেড়ে নিয়েছে সহজ-নিঃশ্বাস। এক হাতে দিয়েছে বাঁচন-মন্ত্র, আর এক হাতে দিয়েছে মারণ-অস্ত্র। এক হাতে নিয়ে এসেছে আশীর্বাদ, আর এক হাতে নিয়ে এসেছে অভিশাপ। দু'টোরই

ফলভোগ করে চলেছে সুসভ্য মানুষ একই কালে, একই সময়ে, যুগপৎভাবে।

অতএব মাথা পেতে আশীর্বাদ নিতে গিয়ে মানুষকে একান্ত অনিবার্যভাবেই অভিশাপটাকেও নিতে হয়েছে। আর তারই জ্বালায় মানুষ আজ অস্থির হয়ে উঠেছে।

তাই জলের নীচের মাছ যেমন বাতাস গ্রহণ করবার জন্যে ক্ষণিকের জন্যে জলের উপর ভেসে ওঠে, তেমনি ইট কাঠ প্রাচীরের অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ শহুরে মানুষ খোঁজে একটু উন্মুক্ত জায়গা—যেখানে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যেও সে সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। ঠিক এই কারণেই নগরের মাঝে নগরপতিরা তৈরী করেছেন উদ্যান—পার্ক।

এখানে প্রতিদিন কত বিচিত্র মানুষের আগমন হয়, কত না বিচিত্র তাদের স্বভাব। কত না বিচিত্র তাদের সমস্যা। কত না বিচিত্র তাদের কথা—।

সকাল থেকে রাত অবধি একটা পার্কের দিনপঞ্জী যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, তবে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যেতে পারে।

এখানে আসে কিশোর কিশোরী তাদের উচ্ছল হাসি নিয়ে, এখানে আসে তরুণ তরুণী তাদের স্বপ্নভরা চোখ নিয়ে, এখানে আসে প্রৌঢ় প্রৌঢ়া সমস্যা নিপীড়িত ন্যুব্জ মন নিয়ে, এখানে আসে হৃতস্বাস্থ্য বৃদ্ধ বৃদ্ধা আসন্ন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আরো বেশীদিন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

আরো আসে। এই সমস্ত হাওয়াসেবীদের কেন্দ্র করে, আসে ঝালমুড়িওয়ালা, আসে হাতে গরম চিনাবাদামওয়ালা, তাছাড়া রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে ফুটপাতের উপর খড়ি দিয়ে একখানা হাত এঁকে, মৃগচর্ম বা পিজবোর্ড—অগত্যা একখানা ছেঁড়া চটের আসনের উপর কয়েকখানা পুরনো বিবর্ণ পঞ্জিকা পাশে নিয়ে বসে থাকেন ত্রিকালজ্ঞ রাজ-জ্যোতিষী। পায়ের উপর পা তুলে গম্ভীর ভাবে

বসে বিড়ি টানেন। দেখলে মনে হবে না—ছুনিয়ায় কিছুতে তাঁর আসক্তি আছে। কতকটা ঠিক বকের মত। জলের ধারে চুপটি করে বসে থাকা. চোখে মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব। যেন কোনো সমাধিস্থ তপস্বী। কিন্তু চ্যালা পুঁটিরা যখন উল্লাসে জলের উপর পুচ্ছ তাড়না করে ওঠে, তখন তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ হতে মুহূর্ত সময় লাগে না। এবং বেশ তৎপরতার সঙ্গে চঞ্চুর বিবরে চ্যালা পুঁটি চালান করে দিয়ে, পুররায় সে সমাধিস্থ হয়ে বসে।

এও সেই রকম। যখন কোনো ভাগ্যান্বেষী পথিক হাতখানা প্রসারিত করে সামনে এসে বসে, তখন ত্রিকালজ্ঞের নির্বিকার ভাবটির সমাধিলাভ ঘটে। হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান গড় গড় করে বলে যান, কাউকে আমির কাউকে ফকির বানিয়ে, কাউকে স্বর্গের সিঁড়িতে তুলে দিয়ে, কাউকে বা অগাধ পঙ্কে ফেলে দিয়ে, তা থেকে উদ্ধার করবার অমোঘ বিধান, কবচ দিয়ে, নিজের হাতখানা প্রসারিত করে দেন। কারণ ত্রিকালজ্ঞের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে যা বোঝায়—তা হ'ল নগদ দর্শনী —ছু'আনার পয়সা।

সত্যিই বিচিত্র এই পার্ক।

অফিসে একটি জরুরী অফিসিয়াল চিঠির খসড়া করছিল সরিৎ। পাশের সহকর্মীটির হঠাৎ এদিকে দৃষ্টি পড়ায়, সে ঠাট্টা করে বলে উঠল—অফিসিয়াল চিঠিপত্রের তো একটা বাঁধাধরা ছক্ আছে বলেই জানতাম। কিন্তু তুমি যে তার মধ্যে একটা নূতনত্ব আনলে সরিৎ!

সরিৎ অবাক হয়ে বললে—কী রকম?

—রকমটি হচ্ছে এই—। বলে সহকর্মীটি টান দিয়ে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল—

'উইথ্ রেফারেন্স্ টু ইওর লেটার নাম্বার এ/ফরটি সেভেন, ডেটেড্ নাইন্ ফোর্ সিক্স্টি সিক্স্, উই আর গ্লাড্ টু ইনফরম্ ইউ ছাট্, অনুসূয়া আর এগ্রীড্—

এতক্ষণে সরিতের টনক নড়ল। সে যারপরনাই লজ্জিত হয়ে

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাগজখানাকে ছোঁ মেরে নিয়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল। অর্থাৎ চিঠিখানা লিখতে গিয়ে কখন যে তার মধ্যে উয়ী (we) এর স্থলে অনুসূয়ার নামটি লিখে ফেলেছে তা তার খেয়ালই নেই— ।

সহকর্মীটি এর মধ্যে একটু রহস্যের গন্ধ পেল। সে চোখ টিপে বললে—কি ব্যাপার ব্রাদার, অনুস্যূয়াটি কে বলত ?

সরিৎ তাড়াতাড়িতে একটা কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললে —বুঝলি ভাই, আসবার পথে, রাস্তার মোড়ে শকুন্তলা সিনেমার একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম। শকুন্তলার কথাটাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। তার যে দুই সখী ছিল অনুস্যূয়া আর প্রিয়ম্বদা ? অনুস্যূয়া নামটা আমার খুব ভাল লাগে। বলে সরিৎ হেসে ফেলল।

সহকর্মীটি চোখ টিপে বললে—তা সব ছেড়ে শকুন্তলা আর অনুস্যূয়াকে নিয়েই বা পড়া কেন ? বলি কোথাও দুষ্মন্তের ভূমিকা নিয়েছ নাকি ?

সরিৎ বললে—আহা-হা, তা ভাবতেও কত সুখ! আচ্ছা দাঁড়া, চিঠিটা শেষ করে নিই।

সহকর্মীটি হেসে বললে—আর একটু হ'লেই তো চিঠিটা অফিসারের ঘরে চলে যেত। সেখানে কিন্তু এই কৈফিয়ত খাটত না।

সরিৎ বললে—যাঃ কি যে বলিস! বলে একমনে চিঠিটা নূতন করে লিখতে লাগল।

কিন্তু হ'লে হবে কি, সরিৎ আজ কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারল না। থেকে থেকে তার চোখের সামনে অজানা অচেনা এক তরুণীর মূর্তি ভেসে উঠতে লাগল। এক এক সময় এক এক রূপে এসে দেখা দিতে লাগল। কখনো পরীদের মত সুন্দরী, কখনো শ্যামাঙ্গী, কখনো গৌরবর্ণা, কখনো বা কাল কুৎসিত কদাকার হয়ে সরিতের চোখের সামনে খেলা করতে লাগল। সরিৎ দেখল, এই মূর্তির সব ক'টিই হ'ল অনুস্যূয়ার।

—দুত্তোর! কি ঝামেলায় পড়া গেল! তার চেয়ে অনিমেষটা বেশ আছে! সে সন্ন্যাসী মানুষ। তার এসব ঝামেলায় কোনোদিন পড়তে হবে না।

অনিমেষ মানে—পুরো নাম অনিমেষ দত্ত। একখানা তিন তলা বাড়ী, অবসরপ্রাপ্ত বাবা হরেন দত্তও আবার কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের মালিক। তাছাড়া নিজে এম্. এস্-সি পাস করে শ আড়াই টাকার একটা চাকরী করে।

সংসারে বাবা আর ছেলে ছাড়া তৃতীয় কোন লোক নেই। অতবড় বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে। একজন উড়ে বামুন এসে দু'বেলা রান্না করে দিয়ে যায়। আর আছে একজন ঠিকা ঝি। পিতা পুত্রকে বিয়ে করিয়ে পুত্রবধূ ঘরে আনবার চেষ্টা করছেন কিছুদিন ধরেই। সেই যেবার অনিমেষ এম্. এস্-সি পাস করল, সেই সময় থেকে। কিন্তু হচ্ছে না। আর এই না হবার কারণ অনিমেষ নিজেই।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে বিষয় সম্পত্তিতে, অনিমেষ যে পরিমাণে ভারী, সেই পরিমাণে তার দেহের আকৃতি কৃশ। কৃশ বলতে যা বুঝায়, তার চেয়েও কৃশ। সরু লিকলিকে, লম্বা প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই। অথবা মনে হয় যে দেহের কাঠামোটা তৈরী হবার পরই, সাত তাড়াতাড়িতে শুধু একটু চামড়া দিয়ে ঢেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে। মাংস লাগাবার সময় পাননি হয়তো স্বষ্টিকর্তা।

এই চেহারাটাই অনিমেষের পক্ষে একটা গভীর লজ্জার কারণ হ'য়ে দাঁড়াল।

কারণ যে ক'টি সম্বন্ধ তার এসেছিল, অনিমেষের আকৃতি দেখেই নাকি তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছিল। তাদের ধারণা—ওই যে সরু কঞ্চির উপর একটি ছোট্ট মুণ্ডু বসানো আছে সেই মুণ্ডুর মধ্যে যত বিদ্যা বুদ্ধিই ঠাসা থাকুক না কেন, কিন্তু ওই সতর ইঞ্চি বুকের মধ্যে যে ততোধিক ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটি আছে তার ধুক ধুকানীর শক্তিই বা কতটুকু—আর তার স্থায়িত্ব?

এক ভদ্রলোক তো অনিমেষের বাবার মুখের উপর স্পষ্টই বলে বসলেন—দেখুন হরেনবাবু, মাছ, মাংস, ব্যঞ্জনাদি আপনি যত সুস্বাদু করেই রান্না করুন না কেন—মূলতঃ সে সব উপকরণ বৈ কিছু নয়,

আসল খাদ্য হচ্ছে ভাত। তা আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, সেই ভাতটাই যদি ভাল না হয় তবে—বলেই হেঃ হেঃ করে খানিকটা হেসে ভদ্রলোক বললেন—বুঝলেন হরেনবাবু, ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি চাকরী-বাকরী বিষয় সম্পত্তি বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে এগুলো আবশ্যকীয় উপকরণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আসলে ছেলের স্বাস্থ্যই যদি—আবার খানিকটা হেঃ হেঃ করে হেসে ভদ্রলোক নমস্কার দিয়ে চলে গেলেন।

মানুষ পড়ে কন্যাদায়ে, আর অনিমেষের বাবা হরেনবাবু পড়লেন পুত্রদায়ে।

এই কথাটাই অনিমেষ একদিন তার আবাল্যের বন্ধু সরিৎকে সখেদে বলেছিল—দ্যাখ্ ভাই, বাবাকে আমার পুত্রদায় থেকে মুক্ত করতে হবেই। তার একটা উপায়ও ঠিক করেছি।

সরিৎ বললে—কি—?

অনিমেষ বললে—আত্মহত্যা করব।

সরিৎ বললে—তুই একটা গাধা।

অনিমেষ বললে—কেন মেয়েরা তো কেউ কেউ এই পন্থা অবলম্বন করে বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করে থাকে। আমিই বা পারব না বল?

রসিক বলারায় বললে—তুই একটা গাধা।

সরিতের ছুদিন পরেই অনিমেষ একদিন গেরুয়া কাপড় পরে
মলে—আচ্ছা পাগড়ী বেঁধে এসে প্রচার করে দিল যে, সে সন্ন্যাসী
হ৷ রসিক বলে এবং নামের শ্রীর সঙ্গে একটি মৎ যোগ করে ও
অ সরিৎ এবার যে আনন্দ যোগ করে একেবারে শ্রীমৎ অনিমেষানন্দ
কটু ঝুঁকে পড়ে সল।
উকে দেখেছ—অনিমেষের সন্ন্যাস গ্রহণের আদি ইতিহাস। এইভাবে
রসিক এবার লে লুকিয়ে বিবাহ রূপ ঝামেলা থেকে আত্মরক্ষা
রে হেসে ফেলল অনিমেষ।
রে বিয়ে হয়েছে লে হবে কি? হরেনবাবু সবই বুঝলেন, তাঁর মাথার

চুলগুলো তো আর অমনি অমনি সাদা হয় নি। দস্তুরমত পঁয়ষট্টিটি বছরের অভিজ্ঞতায় সাদা হয়েছে। তাছাড়া পুত্র-বধূর মুখ দেখার সাধ নিয়েই অনিমেষের মা চোখ বুজেছেন, তাঁরও কি এই আফ্‌সোস নিয়েই যেতে হবে নাকি ?

তিনি গোপনে গোপনে পাত্রীর খোঁজ করতে লাগলেন।

সরিৎ এক ঘণ্টা আগেই ছুটি নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। বিশেষ কোনো যে কাজ আছে, তা নয়, এমনি বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। ট্রাম বাস পাশ দিয়ে হুস্ হুস্ করে যেতে আসতে লাগল। সরিতের মনও হুস্ হুস্ করে ছুটতে লাগল। ট্রামে বাসে না উঠে কেন যে সরিৎ পায় হেঁটে চলল—এর কারণটা সে নিজেও বোধ করি বলতে পারবে না। হাঁটতে হাঁটতে এসে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই পার্কটার চারদিকে বন্ বন্ করে কয়েকটা পাক দিল। তারপর একটা খালি বেঞ্চ দেখে ধপ্ করে বসে পড়ল।

কিছুদূরে ঘাসের উপর জায়গায় জায়গায় কতকগুলো লোক বৃত্তাকারে জড় হয়ে আছে, মাঝে মাঝে সেখান থেকে উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসতে লাগল। মনে হচ্ছিল একটা মারাম[illegible]কারণ [illegible] বা লেগে গেল! তারপর আপনা থেকেই তা আবার স[illegible] যায়। উঁকি দেবার দরকার নেই। ওখানে চারজন তাস খেলছে, আর তাদের ঘিরে আছে চল্লিশ জন। তারা [illegible]দের [illegible] বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে তাস খেলোয়াড়দের সঙ্গে [illegible] আছে [illegible]য়ে গিয়েছে। [illegible]

সরিতের ওসব কানেও যাচ্ছে না, চোখেও পড়ছে [illegible] এই বিশ্বসংসারের মাঝে সে শুধু একটি মূর্তিই দেখতে পাচ্ছে [illegible] অনুসূয়ার।

পার্কে নানা লোক আসে। তারা যার যার ভাবে বিভোর [illegible]য় ঘুরে বেড়ায়। কেউ কারো দিকে ফিরেও তাকায় না। কি[illegible]য়, [illegible]র

চোখ এই সব হাওয়া-সেবীদের উপরই ন্যস্ত থাকে—তাদেরই একজন সরিতের কাছে বসে হাঁক মারল—চীনাবাদাম—।

বলার মধ্যেই যেন ইঙ্গিতটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ এক ঠোঙা চীনাবাদাম হাতে নিয়ে নিন। তাহলে চিন্তা করতে আরো সুবিধা হবে। রসনা সচল থাকলে মনের চিন্তাটাও রসালো হবে।

সরিৎ বললে—গরম আছে ?

চীনাবাদামওয়ালা তার স্বভাবসিদ্ধ ছড়া কেটে বলতে আরম্ভ করল—গরম কি বলছেন বাবু ? এ হাতে গরম, মুখে গরম, পেটে গরম, গরমাগরম, কত দেব তাই বলুন ?

সরিৎ হেসে বললে—তুমি তো বেশ রসিক আছ দেখছি।

লোকটি বললে—আমাদের একটু রসিক না হ'লে চলবে কেন স্যার ? একে তো শুকনো চীনাবাদাম, তার উপর গরম বালিতে ভাজা। তার সঙ্গে আমাদের একটু মুখের রসিকতা না মিশিয়ে দিলে, আপনারা নেবেনই বা কেন আর তা চিবিয়ে রসই বা পাবেন কেন ?

সরিৎ বললে—আচ্ছা যা হ'ক। তা তোমার নামটি কি বল দেখি ?

লোকটি বললে—আমার নাম স্যার, শ্রীরসিকলাল গুড়।

সরিৎ বললে—তা হ'লে রসিকতা আর তোমাকে ধার করতে হয় না বল ?

রসিক বললে—তা যা বলেছেন।

সরিতের কেন জানিনা—লোকটিকে খুব ভাল লাগল। সে হেসে বললে—আচ্ছা রসিক, তুমি বিয়ে করেছ ?

রসিক বললে—তা করেছি।

সরিৎ এবার কি যেন বলতে গিয়ে একটু দ্বিধা করল। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে বললে—আচ্ছা রসিক, তুমি বিয়ের আগে তোমার বউকে দেখেছ— ?

রসিক এবার সরিতের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে ফিক করে হেসে ফেলল। বললে—দেখা কি বাবু, আমাদের যে লভ্ করে করে বিয়ে হয়েছে। বলেই লজ্জায় মুখ ফেরাল রসিক।

ছিটকে উঠল সরিৎ। বললে—এ্যাঁ লভ্ করে! দাও, এক কিলো চীনাবাদাম দাও।

রসিকের জীবনে এইরকম বিদ্‌ঘুটে খেয়ালের খদ্দের আর জোটেনি। সে অবাক হয়ে বললে—এক কিলো! খাবেন না ফেলবেন বাবু?

সরিৎ বলে উঠল—আরে লাকী চ্যাপ্, যা খুশী করি না কেন তুমি দাও। না হয় চার পয়সারই দাও।

রসিক বললে—তাই বলুন। একটা লাইনে আসুন। আচ্ছা নিন। বলে ঠোঙাটা হাতে দিয়ে পয়সা নিয়ে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল রসিক। কারণ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলবার সময় বাবুর হয়তো প্রচুর আছে—কিন্তু রসিকের তা নেই। দু'পয়সা চার পয়সা করে করে বাবুদের কাছে ঘুরে ঘুরে চীনাবাদাম বিক্রী করে, সেই রাত এগারটার সময় বাসায় ফিরবে। যাবার পথে তাকে চাল ডাল নিয়ে যেতে হবে, তবে উনুন জ্বলবে। পেটের আগুনের কাছে যে অন্য কোনো রসিকতাই খাটবে না, রসিক তা ভাল ভাবেই জানে।

সরিৎ চীনাবাদাম খাচ্ছে বটে, কিন্তু তার ক'টা শাঁস আর ক'টা খোসা যে তার মুখে যাচ্ছে, তা তার নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ সরিৎ সচকিত হয়ে উঠল। দুটি যুবক যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। তাদেরই এক বন্ধু দূর থেকে চীৎকার দিয়ে ডাকলে—আরে এই শম্ভু! ছোন্ ছোন্।

যুবক দুটি থামল। বন্ধুটি কাছে এসেই শম্ভুর পিঠের উপর এক কিল বসিয়ে দিয়ে বললে—কোথায় থাকিচ্ বল দেকিনি ছা—, কাল তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান মাইরি।

শম্ভু বললে—আরে ছা—, বলিচ্ কেন, আমাদের ছেই যে ছ্যামলা, তার বোন ছুচিত্রার পাকা দেখা হ'ল, খুব খেলাম মাইরি।

'পাকা দেখা' কথাটি কানে যেতেই সরিৎ এমন ভাবে চমকে উঠল যে তার হাত থেকে চীনাবাদামের ঠোঙাটা ঝপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ওদিকে শম্ভুর বন্ধুটি চোখটিপে মুচকি হেসে বললে—বলিচ্ কি—ছুচিত্রার পাকা দেখাতে ছেছে তুই নিমন্তন্ন খেলি ? বলি মরচে ধরা যৌবনটা একটা মোচড় দিয়ে উঠল না ?

ওদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। হাসতে হাসতে ওরা চলে গেল।

হয়তো বা শ্যামলের বোনকে কেন্দ্র করে একটা বেশ ঘন রহস্য আছে, যার নায়ক হ'ল ঐ শম্ভু।

—হ্যাঁ মশাই, মধুবাবু লেনটা কোথায় বলতে পারেন ?

সরিৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, কোঁচানো ধুতী পরা, গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে পাম্প্ সু। মাথার আধ-পাকা চুলকে সযত্নে আঁচড়িয়েছে, দাড়ি গোঁফ কামানো। দেখলেই বোঝা যায়, যৌবনটাকে ধরে রাখবার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা তার সর্বাঙ্গে। ভদ্রলোক তারই বিপরীতমুখী আর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে এই প্রশ্ন করছেন।

সেই ভদ্রলোককেও সরিৎ ইতিপূর্বে বার দুই দেখেছে। দেখেছে গলাবন্ধ কোট গায়ে, লাঠি হাতে, খাড়া নাকটির নীচে একজোড়া রাশভারী গোঁফের প্রান্ত দুটোকে বাঁ হাত দিয়ে স্ঁচোলো করতে করতে গম্ভীরভাবে মচ্ মচ্ করে পাক দিচ্ছেন। দেখলে মনে হবে দুনিয়ায় তাঁর সমকক্ষ বুঝি কেউ নেই। আর তিনি এখনো আছেন বলেই দুনিয়াটা এখনো টিকে আছে, তিনি মরে গেলে পর যে দুনিয়ার কি হবে—তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

—হ্যাঁ মশাই, মধুবাবু লেনটা কোথায় বলতে পারেন ? নিতান্তই সাধারণ প্রশ্ন, এ তো হামেসাই একে অপরকে করে থাকে। কিন্তু এতে রাশভারী লোকটির মনে কী হ'ল কে জানে, তিনি বাঁ হাত দিয়ে গোঁফটায় একটা মোচড় দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন—পারেন মানেটা কী ? আমি না পারি কী বলতে পারেন ? সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলকাতা নিয়ে, জব্ চার্ণক যখন প্রথম কলকাতার পত্তন করলেন, তখন আমাকে দিয়েই তো লেনগুলোর নামকরণ করালেন। আমি

আবার পারি না বলছেন ? আলবৎ পারি। বলে লাঠিটা ঠুকে দিলেন মাটিতে।

প্রথম ভদ্রলোক যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন—বাঃ বাঃ ধন্য হলুম। আপনি নিশ্চয়ই একজন মহাশয় ব্যক্তি। এবার দয়া করে বলুন, আমার বিশেষ দরকার।

সরিৎ ভদ্রলোক দু'জনের দিকে বার দুই তাকিয়েই হেসে ফেলল। তারপর বেশ আগ্রহের সঙ্গে ওঁদের কথা শুনতে লাগল।

রাশভারী লোকটি বললেন—আপনার বিশেষ দরকার ঐ মধুবাবু লেনটা ?

প্রথম বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাশভারী—রাম শ্যাম যদুকে দরকার নেই ?

প্রথম—আজ্ঞে ওর ভেতর যদুকেই আমি চাই। ওই মধুবাবু লেনে যদুবাবু থাকেন, তাঁকেই আমার দরকার।

রাশভারী—তা হঠাৎ আপনার যদুবাবুকেই বা দরকার হয়ে পড়ল কেন ?

এই জেরার পাল্লায় পড়ে প্রথম ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে বললেন—হঠাৎ নয় মশাই হঠাৎ নয়। অনেকদিন থেকেই আমার দরকার। এখন বলতে পারেন কিনা বলুন।

রাশভারী—পারি মানে ? যদু মধুর বাপ ঠাকুরদাকে পর্যন্ত এনে হাজির করে দিতে পারি।

প্রথম—তাদের বাপ ঠাকুরদাকে আমার দরকার নেই। আমার মধুবাবু লেনের যদুবাবুকে পেলেই চলবে।

রাশভারী—যদুবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কী করে সেটা আগে আমার শোনা দরকার।

প্রথম রেগে গিয়ে বললেন—পরিচয় মানেটা কি মশাই ? ওই যদুবাবুর মেয়ের সঙ্গে, আমার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, এই তিরিশ বৎসর যাবৎ।

এতে রাশভারী লোকটি তো চমকে উঠলেনই—তাছাড়া তাদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে আরও যে দু' চারজন লোক কৌতূহলী হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তারাও চমকে উঠল।

রাশভারী—এঁ্যা তিরিশ বৎসর যাবৎ! তিরিশ বৎসর যাবৎ পাকা হয়ে আছে! আরে তা যে এতদিনে পচে গেছে মশাই!

প্রথম নিদারুণ চ'টে গিয়ে বললেন—আপনি কিচ্ছু জানেন না মশাই। পচে যায় নি, যেতে পারে না।

রাশভারী লোকটি সজোরে লাঠি ঠুকে বললেন—আলবৎ পচেছে। যদি পচেও গিয়ে না থাকে, তবে এতদিনে টুপ্ করে ঝরে পড়েছে, আর হয় তো কেউ টপ্ করে গিলে ফেলেছে।

প্রথম—ভাঙ্চি দেবেন না বলছি, তাহলে আমি কেঁদে ফেলব কিন্তু—হুঁ।

রাশভারী—থাক্ থাক্ মশাই, কেঁদে আর লোক হাসাবেন না। তাহলে আপনার ধারণা, এখনো সে পাকা অবস্থায় ঝুলে আছে?

প্রথম—নিশ্চয়ই।

রাশভারী—বেশ থাক্, ঝুলে থাক্, আপনিও গিয়ে ঝুলে পড়ুন, আমি চললাম। বলে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

প্রথম তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—তা মধুবাবু লেনটা কোথায় বলে দিয়ে গেলেন না?

রাশভারী দ্রুত ঘুরে বললেন—নিন, চট্ করে ধরুন। বলে লাঠির ডগাটা প্রথম লোকটির নাকের ডগা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন।

প্রথম হাত বাড়িয়ে বললেন—কাকে?

রাশভারী—ধরুন মধুকে।

প্রথম—পাচ্ছি কোথায় যে ধরব! বলে তিরিশটি বছর ঘুরে ঘুরে পেলুম না।

রাশভারী বললেন—আমার পাল্লায় যখন পড়েছেন, তখন আর আপনাকে ঘুরে মরতে হবে না। চলুন আমার সঙ্গে।

প্রথম—কোথায়?

রাশভারী—হাতুবাবু লেনে।

প্রথম—কেন?

রাশভারী বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন—আরে সেইখানেই তো সেই হারামজাদ মধুবাবু থাকেন!

প্রথম—বলেন কি!

রাশভারী—হ্যাঁ, এবার আমরা গিয়ে তাকে চেপে ধরব। ব'লব—ভাল চাও তো লেনটিকে বের করে দাও, না হ'লে—

প্রথম—না হ'লে?

রাশভারী—না হ'লে, ওর নামে আমরা কেস্ করব। এই অটল মোক্তারের হাত থেকে কি ওর রেহাই আছে মনে করেন? বলে গর্বভরে ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন।

কৌতূহলী জনতার ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিনে পয়সায় এই মজাটাকে আর একটু স্থায়ী করবার জন্যে তাদের মধ্য থেকে একজন প্রথমকে লক্ষ্য করে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি নিশ্চিন্তে এই মোক্তারবাবুর হাতে আপনার মামলা ছেড়ে দিতে পারেন। দেখবেন মধুবাবু তো মধুবাবু—তার বাপের সুদ্ধ নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবেন।

এই প্রশংসায় অটলবাবু একদম ফুলে ঢোল হ'য়ে গেলেন। প্রথম লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলেন তো, এনারা আমার পুরোনো মক্কেল। আচ্ছা—এবার আপনার নামটি বলুন। ব্রীফ্ তৈরী করতে হবে তো। বলে পকেট থেকে নোটবই আর পেন্সিল বের করলেন।

প্রথম লোকটি বললেন—আমার নাম শ্রীমান রামচরণ বেরা।

অটল মোক্তার পড়তে পড়তে লিখলেন—প্লেন্‌টিফ্—মানে বাদী হচ্ছে—শ্রীমান রামচরণ ভেড়া।

রামচরণ সংশোধন করে দিয়ে বললেন—আজ্ঞে ভেড়া নয়—বেরা।

অটল মোক্তার লেখা শেষ করে বললেন—ইংরেজীতে বেরাকেই ভেড়া উচ্চারণ করতে হয়। যেমন শোনেননি—, মিত্রকে মিটার,

দত্তকে ডাটা। বসুকে ভোস্, বর্ধমানকে বার্ডোয়ান, মেদিনীপুরকে মিড্নাপুর। ইংরেজ চ'লে গেলে কি হবে, আসলে তাদের শাসন ব্যবস্থা থেকে উচ্চারণ পর্যন্ত সবকিছুই আমাদের মেনে চলতে হচ্ছে। যাক গে—, এবার বাবার নাম বলুন।

রামচরণ বললেন—৺শ্যামচরণ বেরা। ওই জন্যেই গোড়ায় আপনাকে বলেছিলাম, আমার রাম শ্যামকে দরকার নেই। রাম আমি, আর শ্যাম হচ্ছেন আমার বাবা।

অটল মোক্তার লিখতে লিখতে বললেন—সে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা তাহলে শ্রীমান রামচরণ ভেড়া—সান্ অফ্ লেট্ শ্যামচরণ ভেড়া।

রামচরণ বলে উঠলেন—আজ্ঞে বাবাকে আর ভেড়া বানাবেন না।

অটল মোক্তার শ্লেষের সঙ্গে বললেন—এবারে যা বললেন মশাই, তাতে আর ইংরেজী ভেড়া নয়—একেবারে বাংলার ভেড়ার মতই কথা বললেন।

রামচরণ বললেন—মানে ?

অটল মোক্তার—আরে মশাই, আমি যদি শ্যামচরণ বেরার পুত্র শ্রীমান রামচরণ ভেড়া লিখে কোর্টে ব্রীফ্ দাখিল করি—হাকিম কি তক্ষুণি মামলাটাকে ডিস্মিস্ করে দেবেন না ? বলবেন—বাদীর বাপের নামে গোলমাল দেখতে পাচ্ছি। চাই কি নাম লুকোবার জন্যে, উল্টে এক নম্বর ফৌজদারী মামলাও দায়ের হাতে পারে। তখন ? আরে মশাই, ভেড়ার বাপ কখনো কি বেরা হতে পারে ? ভেড়াই হয়। বাঁশের গোড়া দিয়ে কি গাবগাছ উঠতে দেখেছেন কখনো ? বাঁশই জন্মে। বাঁশ মানে কি ?—বংশ। বংশ মানে কি ?—বাঁশ। আর একেই বলে বংশগত পদবী। বুঝলেন ? নিন, যা বোঝেন না—তা নিয়ে তর্ক করতে আসবেন না !

এই অকাট্য যুক্তির পর, রামচরণের বাপ ভেড়া না হয়েই যায় না। অগত্যা রামচরণকে তা মেনে নিতে হল।

রামচরণ বললেন—তা তো যেন হ'ল। এবার কী করতে হবে ?

অটল মোক্তার বললেন—দাঁড়ান, আগে ডিফেণ্ডাণ্ট—মানে প্রতিবাদীর নামটা লিখে নিই। প্রতিবাদী হ'ল মধুবাবু অফ্ হাহু বাবু লেন। ফাদার্স নেম্ আন্‌নোন্। মধুবাবুর বাবার নাম আমরা জানি না। কেমন?

রামচরণ বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অটল মোক্তার—এবার ব্রীফটি তৈরী করে চলুন আমরা কোর্টে যাই।

রামচরণ—কোর্টে?

অটল মোক্তার—তবে কি ব্রীফ্ তৈরী করে বড়বাজারে যাব নাকি মশাই?

রামচরণ—কোর্টে গিয়ে কী বলবেন?

অটল মোক্তার—কেন কোর্টে গিয়ে সোজা বলব—তারপর বেঞ্চে বসা সরিতের দিকে তাকিয়ে বললেন—মনে করুন ইনিই হচ্ছেন হাকিম। বলে কোর্টে যেমন করে সওয়াল করে তেমনি ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলেন—ইওর অনার! লেন হচ্ছে পাবলিক রোড্। সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তা। তা এই পাষণ্ড মধুবাবু, তার লেনটিকে এই তিরিশ বৎসর যাবৎ লুকিয়ে রেখে, আমার মক্কেল, নিরীহ রামচরণ ভেড়াকে, কি হয়রানিটাই না করেছে! ইওর অনার! এখানে আমি যদি একটি উপমার উল্লেখ করি, তাহলে আশা করি সেটা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইওর অনার! আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পশুদের মধ্যে ভেড়া হচ্ছে সবচেয়ে নিরীহ অথচ উপকারী জীব। ভেড়ার লোম দিয়ে কম্বল তৈরী হয়। সেই কম্বল, শীতের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে। তেমনি ভেড়ার মাংস অতি উপাদেয় খাদ্যও বটে। মাটন্ চপ্ বা মাটন কারী, রেঁস্তোরা বা হোটেলে, অত্যন্ত লোভনীয় খাদ্য। আমার মনে হয় এই দুটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ইওর অনার! মাপ করবেন—আপনার রসনাও বোধ হয় সজল হয়ে উঠেছে। আর বলতে দ্বিধা নেই —আমারও। বলে একটু হাসলেন অটল মোক্তার।

রামচরণ বলে উঠলেন—আহা-হা হুজুরকে আসল কথাটা বলুন।

অটল মোক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখুন মশাই, মোক্তারের পিছনে আপনার আর মোক্তারী করতে হবে না। আপনি মক্কেল, আপনি আইনের কী বোঝেন? তা ছাড়া আপনার কোন কথা বলার আইন নেই—জানেন? চুপ করে থাকুন। আমাকে গ্রাউণ্ডটা তৈরী করতে দিন। বলে আবার তাঁর সওয়াল আরম্ভ করলেন—ইওর অনার! সেই ভেড়াকে যদি কেউ অযথা উৎপীড়ন করে তাহলে নিঃসন্দেহে সেটাকে পাশবিক আচরণ বলেই ধরে নিতে হবে। অথচ এখানে দেখুন, আমার মক্কেল শ্রীমান রামচরণ ভেড়া, আসলে ভেড়া নন। তিনি দস্তুর মত মানুষ! তাঁর প্রতি মধুবাবুর এই আচরণকে বিনা দ্বিধায়, অমানুষিক বলা যেতে পারে। কারণ এই মধুবাবু লেনে যে যদুবাবু থাকেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার মক্কেলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে, এই দশ বৎসর—

রামচরণ তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিয়ে বললেন—দশ বৎসর নয়, তিরিশ বৎসর—

অটল মোক্তার—ছরি, তিরিশ বৎসর যাবৎ। সেই লেনটিকে মধুবাবু এতদিন লুকিয়ে রাখায়, আমার মক্কেল সেই যদুবাবুকে খুঁজে পাচ্ছেন না। আর স্বভাবতই তাঁর মেয়ের সঙ্গে এঁর বিয়েও হতে পারছে না। এতে আমার মক্কেলের মনোবল ভেঙে পড়েছে—

রামচরণ বলে উঠল—আজ্ঞে না, আমার মনোবল এখনো অটুট আছে।

অটল মোক্তার একটু হেসে বললেন—সুখের কথা। আমার মক্কেলের মনোবল এখনো অটুট আছে। কিন্তু তাঁর চুলে পাক ধরেছে, দেহ জীর্ণ হতে চলেছে, আর আমার মনে হয়, তাঁর মাথায়ও একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। আমার মক্কেল খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আর সবার মূলে হ'ল ঐ মধুবাবু। ইওর অনার! মধুবাবু যে দোষী, আশা করি আমি তা প্রমাণ করতে পেরেছি। আমরা এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও মধুবাবুর শাস্তি প্রার্থনা করছি। সওয়াল

শেষ করে এমনভাবে রামচরণের দিকে চাইলেন যেন কোর্টে তাঁর জিত হয়েছে। তারপরে কৃতিত্বের হাসি হেসে বললেন—তাহলেই দেখবেন, ঐ মধুবাবু দৌড়ে এসে তার লেনটিকে আমাদের হাতে তুলে দিতে পথ পাবে না।

রামচরণ ততক্ষণ কোর্টের রায় শুনবার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন। এবার বললেন—তাহলে যত্নবাবুর কী হল?

অটল মোক্তার তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—আপনার যে আর তর সইছে না মশাই! দাঁড়ান, মধুবাবুর হাত থেকে আগে লেনটাকে তো বের করি। তারপর যত্নবাবুর কান ধরে টেনে আনতে কতক্ষণ?

রামচরণ এবার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন—সাবধান মশাই, মানী লোকের কানে হাত দেবেন না বলছি, তিনি হচ্ছেন আমার শ্বশুর মশাই।

অপ্রতিভ হয়ে অটল মোক্তার বললেন—তা বটে! আচ্ছা না হয় গলায় বস্ত্র দিয়েই আনলাম। তারপর তার মেয়েকে—

আঁতকে উঠলেন রামচরণ। বললেন—খবরদার! ওদিকে হাত বাড়াবেন না বলে দিচ্ছি। তিনি আমার স্ত্রী।

গভীর বিরক্তির সঙ্গে বললেন অটল মোক্তার—এ তো আচ্ছা বে-আক্কেলে মক্কেলের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি! এদিকে হাত দেব—সাবধান, ওদিকে হাত বাড়াব—খবরদার! অথচ আপনার স্ত্রীকে আমার চাই-ই।

রামচরণ বললেন—বলি কেন? আমার স্ত্রীকে আপনার চাই কেন?

অটল মোক্তার বললেন—এই মামলায় তিনিই তো প্রধান সাক্ষী।

রামচরণ বললেন—তা সাক্ষী থাক আর যাই থাক, মোদ্দা আমার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি টানাটানি করবেন না; এই আমি সাবধান করে দিলাম।

অটল মোক্তার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। বললেন—দেখুন মশাই, অত সাবধান খবরদারের ধার অটল মোক্তার কোনো

দিন ধারে না। আমি চল্লাম, আপনার কেস্ আমি করতে পারব না। বলে লাঠিটা একবার মাটিতে ঠুকে, যাবার জন্যে পথ ধরলেন।

রামচরণ ততোধিক রেগে গিয়ে বললেন—যান—যান মশাই, আমিও আপনার পায় ধরে সাধছি না।

অটল মোক্তার ফস্ করে ফিরে লাঠিটা রামচরণের নাকের কাছে বার দুই ঘুরিয়ে বললেন—তাহলে ঐ যদু মধু করে আরো তিরিশটি বছর ঘুরুন। হুঁঃ—যত সব মাথা খারাপ মক্কেলের পাল্লায় পড়া গেছে! বলে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

রামচরণ রাগে ফেটে পড়লেন—অপস্রিয়মান অটল মোক্তারকে লক্ষ্য করে বললেন—ঘুরব ঘুরব, আমি সারাটি জীবন ধরে ঘুরব। তবু তোমার মত মোক্তারের কাছে মামলা নিয়ে যাব না। হুঁঃ—যত সব পাগল!

উভয়ে উভয়কে পাগল সাব্যস্ত করাতে, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ এবার হাসিতে ফেটে পড়ল। রামচরণ বেরার অবশ্য সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি সরিৎকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ মশাই, মধুবাবু লেনটা কোথায় বলতে পারেন?

সরিৎ হেসে বললে—আমিও ঐ রকম একটা খুঁজছি কিনা।

রামচরণ বললেন—ওঃ আপনিও খুঁজছেন? অথচ পাচ্ছেন না?

সরিৎ বললে—ঘটনাটা প্রায় সেই রকমই বটে।

রামচরণ হতাশ হয়ে বললেন—তাহলে আপনাকে জিজ্ঞেস করে আর কী হবে? আপনি আর আমি দুজনেই তো সমান। বলে রামচরণ সরিৎকে কতকটা সহানুভূতি জানিয়েই যেন চলে গেলেন এবং যাকে দেখতে পেলেন তাকেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—হ্যাঁ মশাই, মধুবাবু লেনটা কোথায় বলতে পারেন?

পার্ক ছাড়িয়েও তাঁর কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল—হ্যাঁ মশাই, মধু বাবু লেনটা কোথায় বলতে পারেন?

সরিতের মনটাকে একটা মস্ত নাড়া দিয়ে গেল লোকটি। ওই লোকটি আর সে সমান!

সরিৎ ভাবতে লাগল রামচরণ বেরার কথা। ওই লোকটি সারা জীবন ধরে মধুবাবু লেন খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত একদিন নিমতলা চলে যাবে। লোকটির জীবনে মধুবাবু লেন কোনোদিনই মধুময় হয়ে এসে দেখা দেবে না। হয় তো বা এর ভেতর লোকটির কোনো বেদনাময় ব্যর্থতার কাহিনী লুকিয়ে আছে। আজ যা সকলের হাসির খোরাক যোগাচ্ছে, সেই কাহিনীই হয় তো লোকটির জীবন এমনি ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কী সেই কাহিনী—কী সেই ইতিহাস—কী তার ব্যথা, কতখানি তার গভীরতা—আজ কেউ তার খোঁজ নেবার প্রয়োজন বোধ করে না। সকলে যে ওই লোকটিকে নিয়ে খানিকক্ষণ মজা করতে পারল—এটাই হ'ল তাদের নগদ পাওনা।

হয় তো বা কোনো অশুভলগ্নে, এ ভালবেসেছিল কোনো এক যত্নবাবুর মেয়েকে। স্বপ্ন দেখেছিল তাকে ঘরণী করে ঘর বাঁধবার। সে ভালবাসায় কোনো ফাঁক ছিল না, ফাঁকি ছিল না। তবু সুচতুর বিধাতার নির্মম ইঙ্গিতে হারাতে হ'ল তার প্রিয়াকে। হারাতে হ'ল যত্নবাবুকে, তারপর হারিয়ে ফেললে নিজেকে। তাই সে আজ দিশেহারা হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই মধুবাবু লেনটা। যেখানে থাকত যত্নবাবু আর থাকত তার প্রাণ হ'তে প্রিয়, প্রাণের প্রিয়তমা।

সরিৎ আরো হয়তো ভাবত। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেল, তার বন্ধু, সেই শ্রীমৎ অনিমেষানন্দ স্বামীজী, হন্ হন্ করে এদিকেই আসছে।

অনিমেষের দেহের গড়নটা পাতলা হওয়ায় বাতাস কেটে দ্রুত চলার পক্ষে বেশ সুবিধাই হয়েছে। অনিমেষ যখন তাকে ছাড়িয়ে কয়েক পা চলে গেল, তখন সে বলে উঠল—প্রভু, তুমি দয়া করে ঠুঁটো হও, আমি নয়ন ভরে, তোমার সেই ঠুঁটো রূপটা দেখি।

অনিমেষ চকিতে পিছন ফিরেই একগাল হেসে কাছে এসে বললে—আরে! সরিৎ যে! তুই এখানে?

সরিৎ বললে—তোমার কি বসবার সময় আছে প্রভু?

অনিমেষ বললে—নিশ্চয়ই। বলে পাশে বসে পড়ল।

সরিৎ বললে—বাঁচালে যা হ'ক। আমি তো তোমার চলার গতি দেখে ভেবেছিলাম, হয় তো কোনো ভক্তের আহ্বানে ছুটে চলেছ। হয় তো বা কোনো ভক্তিমতী তোমার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন। অথবা প্রকৃতির আহ্বানে, গেরুয়া অপবিত্র হবার ভয়ে কোনো সুবিধাজনক স্থানের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছ। তোমাদের নীলে আমাদের সাধারণ মনিষ্যির বোঝা তো সম্ভব নয়!

অনিমেষ বললে—অতএব বুঝতে চেষ্টা কোর না। সে কথা যাক। তা তোর কী ব্যাপার?

সরিৎ বললে—আমার ব্যাপার আর কিছুই নয়। এখন আমি কাঁটাপুকুর লেনটা খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলতে পারিস কোথায় সেটা?

অনিমেষ বললে—সে তো বাগবাজারে! ওঃ হোঃ হোঃ—সেইখানেই তো তোর ইয়ে? আমি বৌদির কাছে সব শুনে এসেছি যে! তা পাকা দেখা তো হয়ে গেছে—না রে?

সরিৎ বললে—হুঁ, দেখাটা পাকাপাকিই হয়েছে।

অনিমেষ বাঁ চোখটা টিপে একটু হেসে বললে—তা দেখতে কেমন রে?

সরিৎ বললে—তা রাজকন্যা থেকে ঘুঁটেকুড়ুনী—যে কোনো রূপেই তাকে কল্পনা করতে পার।

অনিমেষ বললে—তার মানে, তুই তাকে দেখিসনি?

সরিৎ চোখ বুজে বললে—চর্মচক্ষে নয়, কল্পনায়। হ্যাঁরে, ধ্যানে বসে গেলে কেমন হয়? তোরা তো সন্ন্যাসী মানুষ। ধ্যানের খবর টবর রাখিস।

অনিমেষ বেশ বিজ্ঞের মত বললে—তা ধ্যান করতে হ'লে, একটা রূপ তো কল্পনা করতেই হবে। তা তুমি ঘুঁটেকুড়ুনী রূপে কল্পনা করলে, সেই রূপেই এসে তিনি দেখা দেবেন!

সরিৎ বললে—তাহ'লে কী করা যায় বল দেখি?

অনিমেষ বললে—তুমি কাঁটাপুকুরে চলে যাও।

সরিৎ তার গলার স্বরটা অনুকরণ করে বললে—হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে কাটা পড়ি আর কি!

অনিমেষ বললে—কেন?

সরিৎ বললে—আরে বাবা, সেখানে আমার জন্যে একশ-চুয়াল্লিশ-ধারা জারি করা আছে। বিয়ের আগে প্রবেশ নিষেধ। এটাই হ'ল আমাদের পারিবারিক আইন। বুঝলি?

অনিমেষ বেশ জোরের সঙ্গে বললে—আইন অমান্য কর। একশ-চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ কর। একদিন বিকেল বেলা চলে যাও ঠিকানা মত। সুবিধা মত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখ বাড়ীটার দিকে। কোনো সময় না কোনো সময়, তিনি ঘর-বার করবেনই।

সরিৎ বললে—তারপর পাড়ার ছেলেরা আমাকে ধরে, বেশ করে রদ্দা লাগাক আর কি!

অনিমেষ বললে—মোদ্দা দৌড়তে পারিস তো?

সরিৎ বললে—সে তো তুই জানিসই—। কলেজের স্পোর্টসে দু'দুবার ফার্স্ট হয়েছিলাম।

অনিমেষ বললে—তবে আর ভয়টা কিসের শুনি?

সরিৎ বললে—স্পোর্টসে দৌড়িয়েছি, সে একটা আলাদা কথা। কিন্তু সেখানে আমি যদি রাস্তা দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটতে থাকি, আর পেছন পেছন চোর চোর করে পাড়ার ছেলেরা ছুটতে থাকে, সেই দৃশ্যটি কল্পনা কর!

অনিমেষ স্বীকার করে বললে—তা বটে! তবে এটাও একপ্রকার চুরিই তো বটে!

সরিৎ বললে—তার চেয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে যদি যাই—, এমন তেমন দেখব, ট্যাক্সিতে উঠে হাওয়া—।

অনিমেষ সমর্থন করে বললে—দি আইডিয়া! আরে ডাকাতরা তো ট্যাক্সিতে করেই হাওয়া কাটে! তুই তাই কর। কথা কটি

বলে অনিমেষ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যেন একটা মস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

সরিৎকে বড় উতলা করে দিল অনিমেষ। বললে—তাহ'লে তুই একবার যেতেই বলছিস সেখানে ?

অনিমেষ জোর দিয়ে বললে—হ্যাঁরে—হ্যাঁ। আরে বাপু, যাকে নিয়ে জীবন কাটাবি, তিনি গোল কি লম্বা, পরী না চেড়ী, দিশী কি বিলিতী ব্রাণ্ড, একবার দেখে নিবিতো ?

সরিৎ বললে—ছাখ, যদি কিছু কেলেঙ্কারী হয়, তাহলে তোর আর কিন্তু রক্ষে নেই বলে দিলাম !

অনিমেষ সরিতের মাথার উপর ডানহাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে রেখে বললে—মা ভৈঃ বৎস—।

সরিৎ বললে—আচ্ছা রেলিংয়ের ওপাশে, ফুটপাথের উপর খড়ি পেতে যে ত্রিকালজ্ঞ মশাই বসে আছেন, তাঁকে একবার ডাক দেখি।

অনিমেষ বললে—কেন ?

সরিৎ বললে—দেখি, হাত দেখে, আমার ভাবী স্ত্রীর আকৃতি কিছু বলে দিতে পারে কিনা।

অনিমেষ বললে—দূর ! ছাই পারবে—এসেই এক গাদা কবচ নিতে বলবে !

সরিৎ বললে—সত্যিই বিচিত্র এই পার্ক। আমি যদি লেখক হ'তাম, তাহলে এই পার্ক নিয়েই একখানা বই লিখে ফেলতাম। এই ঘণ্টা তুইএর মধ্যে কত বিচিত্র চরিত্রের লোকেরই না দেখা পেলাম !

অনিমেষের তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে সরিৎ ফিরে দেখল, অনিমেষ খুব গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবছে। সরিৎ বললে—কী রে ! তোর ধ্যানের সময় হ'ল নাকি ?

অনিমেষ বললে—না, ধ্যান ভঙ্গ হবার সময় হ'ল।

সরিৎ বললে—কী রকম ?

অনিমেষ মুখ কালো করে বললে—আমিও বিয়ে করছি !

সরিৎ বললে—সে কি রে! এখনো তোর গেরুয়া পোশাকটা পরা আছে যে!

অনিমেষ বললে—গেরুয়ার আড়ালে আত্মগোপন করেও আত্মরক্ষা করতে পারলাম না। বাবা আমাকে সেখান থেকেও টেনে বের করেছেন। আর বলে দিয়েছেন আমি যদি বিয়ে না করি, তাহলে আমার সামনেই তিনি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বেন।

সরিৎ বললে—কী সাংঘাতিক! তার চেয়ে দড়িগাছা তোর গলাতেই দে। না হলে শেষে কি তুই পিতৃঘাতী হবি নাকি? তবে পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না তো?

অনিমেষ বললে—না, এবারে ব্যাপারটা অন্য রকম।

অন্য রকমই বটে! কথায়ই বলে সৎ চেষ্টা কখনো বিফলে যায় না। অনিমেষের বাবা হরেন দত্তরও বিফলে গেল না। কারণ এবারে তিনি মেয়ে না খুঁজে প্রথমেই খোঁজ করলেন মেয়ের বাপকে। তিনি প্রথমেই ছেলের রূপ গুণ চেহারা বর্ণনা করে বললেন—এতে যদি আপনাদের মত থাকে তো কথাবার্তা চালাতে পারেন। তাতে অনেকেই পিছিয়ে গেলেন, অবশেষে যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি আর কেউ নন, হরেনবাবুরই কর্মজীবনের সহযোগী, গণপতি সিংহ। দুজনেরই বয়স হয়েছে, দুজনেরই সমান সমস্যা, দুজনেরই সমান আগ্রহ—অতএব দুজনেই রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু একটা বাধা এসে উপস্থিত হ'ল। সেটাও উভয় পক্ষের সমান। সেটা হ'ল ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নিয়ে। তার সমাধানও গণপতিবাবু করে দিলেন। বললেন—বুঝলে হরেন, আমার ভাগ্নে জগবন্ধু, তোমার ছেলের বন্ধু। অতএব তাকেই যদি আমরা মিডিয়াম্ হিসাবে নিযুক্ত করি, তাহলে আমার মনে হয়, সবদিক দিয়ে ভাল হবে। আমার মেয়েটাও যেমন ওর কথা একটু মান্য করে, তেমনি বন্ধু হিসাবে তোমার ছেলেও তার কথা একেবারে ঠেলতে পারবে না। তারপর ওর চেষ্টায় যদি পরস্পরের সাক্ষাৎটা ঘটে যায়, তারপর যে রকমটি ঠিক করেছি করা যাবে।

হরেনবাবু বললেন—আমি সব তাতেই রাজী। তোমার যেমন কন্যাদায়, আমারও তেমন পুত্রদায়।

যাই হোক, পূর্বকথা মত, সবই ঠিক ঠিক হল। জগবন্ধু প্রস্তাব নিয়ে এল হরেনবাবুর কাছে। অনিমেষ তখন বাড়ী ছিল না। হরেনবাবু আর জগবন্ধু মিলে একটু পরামর্শ হ'ল। এমন সময় অনিমেষ বাড়ী ফিরে এসে সেই ঘরে ঢুকেই জগবন্ধুকে দেখে অবাক হয়ে বললে—জগা—তুই! অনিমেষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হরেন-বাবু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন এবং বললেন—শুনে যাও, জগবন্ধু কি বলছে, শুনে তোমার মতামত এক্ষুনি আমাকে জানিয়ে দেবে। আর জেনে রাখ, তোমার মতামতের উপরই আমার বাঁচা মরা নির্ভর করছে।

অনিমেষ বললে—মানে—?

হরেনবাবু বললেন—মানে এবারেও যদি তুমি অমত কর, তাহলে তোমার সামনেই আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব। বলে হরেন বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অনিমেষ রেগে গিয়ে বললে—জগা, শেষকালে তুই—!

জগবন্ধু হেসে বললে—আমি তোমার বন্ধু।

অনিমেষ বললে—বন্ধু না ছাই। শত্তুর—শত্তুর—মহাশত্তুর!

জগবন্ধু বললে—তোর আইবুড়ো নামটা ঘোচাতে এসে, আমি কি তোর শত্তুরের কাজ করলাম বলতে চাস? ছাখ, আমার মামাতো বোনটি দেখতে শুনতে, লিখতে পড়তে, চলতে বলতে একদম চৌখস। আমি নির্ঘাত বলে দিতে পারি, তুই তাকে দেখলেই ভিরমী খেয়ে পড়বি।

তারপর জগবন্ধুর বক্তৃতায় আর হরেনবাবুর হুমকীতে অনিমেষ রাজী হ'য়ে গেল। তবে এক শর্তে, নিজে আগে মেয়ে দেখবে।

অনিমেষ ঘোঁৎ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল।

সরিৎ বললে—কী হ'লরে—?

অনিমেষ বললে—ভাবছি, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতেই হ'ল।

সরিৎ বললে—কপালে তোর বিয়ে আছে, তুই তার কী করতে পারবি, বল্ ?

অনিমেষ বললে—বাবার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করাই ঠিক করলাম।

সরিৎ বললে—পুত্রের কঠোর কর্তব্য পালন করলি বল !

অনিমেষ বললে—তবে নিজে দেখে শুনে—

সরিৎ পাদপূরণ করে দিয়ে বললে—আর নিরাসক্ত ভাবে পছন্দ করে।

অনিমেষ বললে—এটাও বাবার ইচ্ছে ভাই।

সরিৎ তার থুঁৎনিটা নাড়িয়ে দিয়ে বললে—সবই বাবার ইচ্ছে বাবা, তো .ার ইচ্ছে বলে কিছু নেই ?

অনিমেষ বললে—মেয়েটি নাকি যাকে বলে বিদুষী। আরে সেই যে আমাদের জগবন্ধু, যাকে আমরা গজবন্ধু বলে ডাকতাম তারই মামাতো বোন।

সরিৎ বললে—তাই নাকি— ?

অনিমেষ বললে—কালই মেয়ে দেখতে যাব, তুইও চল্ না।

সরিৎ বললে—আমি !

অনিমেষ বললে—ক্ষতি কি ?

সরিৎ বললে—কেন, তোর বডিগার্ড হ'য়ে নাকি ?

অনিমেষ বললে—না-না আমি বলছিলাম তোর নিজেরটা দেখার আগে, একটা প্রথম পাঠ নিয়ে নিবি।

সরিৎ একটু চিন্তা করল। তারপর বললে—ঠিক আছে—তাই চল্। ওখানে যাবার আগে, একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই আসা যাক।

অনিমেষ বললে—বাঁচালি ভাই।

সরিৎ বললে—কিন্তু তোকে যে রকম কাহিল দেখাচ্ছে, তাতে আমার মনে হয়, তোর একটা হার্ট স্টিমুলেণ্ট ইন্‌জেক্‌সন্ নেওয়া উচিত।

অনিমেষ সরিৎকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে—দূর—। কী যে বলিস!

গণপতি সিংহের ব্লাড প্রেসারটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। ডাক্তাররা চেষ্টা করে করে ঘায়েল হ'য়ে গেলেন।

ডাক্তার বলেন—কি আশ্চর্য—!

গণপতিবাবু হেসে বলেন—সবচেয়ে আশ্চর্য, প্রেসারের কারণটা আপনারা আজও বুঝতে পারলেন না।

ডাক্তারী শাস্ত্রে অবশ্য সেই কারণটা লেখা নেই, যে কারণটা গণপতিবাবু অনুমান করেন। অনুমান বললে ভুল হবে, গণপতি-বাবু এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত।

গণপতি সিংহ আর তাঁর স্ত্রীর দুজনেরই দেহ মেদবহুল। তাঁদের একটি মাত্র সন্তান ঝরণা, বাবা মা'র মেদটুকু সঙ্গে নিয়েই জন্মেছে।

মেয়েকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলতে গণপতিবাবু চেষ্টার কসুর করেন নি। সেদিক দিয়ে কোন খুঁতই নেই। শুধু তাই নয়, মেয়ের কোনো ইচ্ছাতেই বাধা দেন নি বাবা-মা। ফল যা হবার তাই হ'ল। মেয়েটি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা হয়ে উঠল। আর তার ফলে মেয়েকে কিছু বলবার সাহস বাবা-মা দুজনেই হারিয়ে ফেললেন। কাজে কাজেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মেয়েকে কেন্দ্র করে একটা স্থায়ী কোঁদলের সৃষ্টি হ'য়ে গেল। একে অপরকে দোষারোপ করে বলেন—তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়েই মেয়েটা এমন ধিঙ্গী হয়ে উঠেছে।

গণপতিবাবুর স্ত্রীর স্বপক্ষে অবশ্য একটা যুক্তি আছে। কারণ তুলনায়, গণপতিবাবুর চেয়ে তাঁর স্ত্রীর দেহে মেদ কিছুটা বেশী। অতএব তাঁর উঠতে বসতে, খেতে শুতেই প্রাণান্ত। তার উপর মেয়ের সঙ্গে বকর বকর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং দুর্ভাগ্যবশত গণপতিবাবুর দেহে মেদের পরিমাণ কিছুটা কম থাকায় দোষটা গিয়ে চাপল সম্পূর্ণ তাঁর ঘাড়েই।

এদিকে ঝরণা এসবের কোনো তোয়াক্কা রাখে না। আর এসব ব্যাপারে কান দেবার তার সময়ও নেই। তার নানা কাজ। কোনো সংঘের সে সম্পাদিকা, কোনো সংঘের সে সভানেত্রী, কলেজের স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নের সে কার্যকরী সমিতির সভ্যা। তার উপর নিজের বাড়ীতেই সে একটি 'সমাজ সংস্কার সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে বসেছে।

সমাজ সংস্কার করার আগে সে নিজের নামটা সংস্কার করে নিল। বাবা মার দেওয়া নামটা তার কাছে অত্যন্ত কোমল বলে মনে হ'ল। অথচ তার দেহ যেমন ভারী মনটাও তেমনি শক্ত। অতএব তার দেহ আর মনের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রেখে, সে তার নামের ঝরণা শব্দটির আগে, ঝরণার অন্যতম উৎপত্তিস্থল হিমালয়টা যোগ করে শ্রীমতী হিমালয় ঝরণা সিংহ নাম ধারণ করল। 'মেয়েলীপনা' বলে বাংলায় যে একটা গালাগাল প্রচলিত আছে, হিমালয় ঝরণা সিংহ তার মূর্ত প্রতিবাদ। প্রেমের প্যান প্যানানি ঘ্যান ঘ্যানানিকে সে নিতান্তই বাজে সেণ্টিমেণ্ট বলে মনে করে। দু'চারটে ছোঁড়া যে তার পিছনে ঘুর্ ঘুর্ করেনি তা নয়। কিন্তু তার বিপুল দেহ আর সুবিপুল তেজ দেখে ভড়কে গেছে।

সংঘ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে না দেখতে, সভ্য সভ্যারা পিল্ পিল্ করে আসতে লাগল। এল লিলি রায়, ক্রন্দসী চ্যাটার্জী, বন্দিতা রাহা—এল ঘটোৎকচ তলাপাত্র, ভীমপদ বটব্যাল, গজেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর সংঘের অফিসে বিতর্ক সভা বসে। বিতর্কের বিষয় পূর্বদিন অধিকাংশ সভ্য সভ্যার মত অনুসারে ধার্য হয়। এবং সম্পাদিকা তা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে রাখে। পরদিন কেউ-বা স্বপক্ষে কেউ-বা বিপক্ষে যোগ দেবার জন্যে খাসা খাসা যুক্তিবাণে সজ্জিত হয়ে বিতর্ক সভায় যোগদান করে। বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে যতগুলি যুক্তি দেখানো হয়, তার সবগুলিই সম্পাদিকা একটি বিশেষ খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখে, এবং যথারীতি সেটা আলমারির

মধ্যে তালাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করে। এইভাবে সুপরিকল্পিত ভাবে সমাজ সংস্কার করে চলেছে সমাজ সংস্কার সংঘের কর্মীবৃন্দরা।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গণপতিবাবুর সামনের দিকের ঘরখানা সভ্য সভ্যাদের ধুন্ধুমার তর্ক বিতর্কে গম গম করতে থাকে। আর তারই পাশের ঘরে গণপতিবাবুর ব্লাড প্রেসারটা উচ্চ থেকে উচ্চে উঠতে থাকে। গণপতিবাবু মাথায় পাঁচখানা ভিজে গামছা চাপিয়েও সেই উচ্চ গতিকে রোধ করতে পারছেন না। অগত্যা তিনি দুই কানে ঠেসে তুলো গুঁজে দিয়ে কোনমতে সময়টা কাটান। গণপতিবাবুর স্ত্রী স্বাস্থ্য বদলাবার অজুহাতে বাপের বাড়ী চলে গেছেন। বেচারী গণপতিবাবু শুধু অসহায়ের মত পড়ে পড়ে মার খেতে লাগলেন।

কিন্তু উপায় কী ?

একমাত্র উপায় হ'ল মেয়ের বিয়ে দেওয়া। সে চেষ্টাও গণপতিবাবু করছেন বহুদিন ধরেই। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল হিমালয় স্বয়ং। হিমালয় ঝরণা তার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে,—সন্তান হিসেবে তোমাদের প্রতি আমারও একটা কর্তব্য আছে, অতএব আমাকে যদি বিয়ে দিয়ে তোমরা সুখী হও, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ছেলে বা ছেলেপক্ষ এসে যে আমাকে খুঁটিয়ে খাটিয়ে দেখবে, সে অপমান কিন্তু আমি সহ্য করব না বলে দিচ্ছি।

গণপতিবাবু সভয়ে বললেন—তবে কী করতে হবে ?

হিমালয় ঝরণা বললে—আমিই যাব ছেলের বাড়ীতে।

আঁতকে উঠলেন গণপতিবাবু। বললেন—সে কি !

হিমালয় বলল—হ্যাঁ। তুমি কোন্ কোন্ ছেলেকে দেখেছ, তাদের নাম ঠিকানাগুলো দাও তো আমাকে। এ্যালফাবেটিকালি একটা প্যানেল তৈরী করে নি।

প্রমাদ গণলেন গণপতিবাবু—এ কি হয় নাকি— ?

হিমালয় ঝরণা বললে—কোনোদিন হয়নি বলেই তো আমি দেখিয়ে দিতে চাই, যে আমরা মণিহারী দোকানের জিনিস নই। উল্টোটা হোক না, দেখি ছেলের দল কেমন সইতে পারে ?

গণপতিবাবু অতিকষ্টে মেয়েকে নিরস্ত করলেন।

হিমালয় ঝরণা বললে—বেশ, না হয় নাই গেলাম। কিন্তু ছেলে বা ছেলেপক্ষ যেই আসবে, তাদের সঙ্গে যা কথাবার্তা আমিই বলব। তুমি অসুস্থ মানুষ, তোমার এসবের মধ্যে আসবার দরকার নেই।

অগত্যা গণপতিবাবুকে মুখ বুজে সমর্থন করতে হ'ল।

জগবন্ধু ছেলেটি সত্যিই ভাল। পড়াশুনা করেছে বি. এ. অবধি। কিন্তু পাশ করতে পারে নি। তা না করুক। কিন্তু ছেলে হিসাবে চমৎকার। গণপতিবাবু তাঁর এই ভাগ্নেটিকে বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখেন। তিনিই জগবন্ধুকে একটি চাকরী যোগাড় করে দিয়েছেন। সে এখন বাবা মা ছোট ছোট ভাই বোন নিয়ে দিব্বি আছে। জগবন্ধুর বিশেষ কোনো বাতিক নেই। নেহাতই তথাকথিত ভাল ছেলে।

কিন্তু হিমালয় ঝরণার মতে, জগবন্ধু এযুগে নিতান্তই অচল।

হিমালয় বলে—জগাদা, তুমি এযুগে জন্মেও সেই মধ্যযুগেই বাস করলে। এযুগের হাওয়া আর গায়ে লাগালে না।

জগবন্ধু হেসে উত্তর দেয়—তুই কি মনে করিস, তোরা এযুগের হাওয়ার মধ্যেই বাস করছিস?

হিমালয় বললে—কেন, তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে নাকি?

জগবন্ধু বললে—ঘোরতর—।

হিমালয় বললে—মানে—?

জগবন্ধু বললে—মানে, আমার মনে হয়, তোরা এযুগের হাওয়ার মধ্যে বাস না করে এযুগের ঝড়ের মধ্যে বাস করছিস। অবশ্য দুটোই হাওয়া, একটা মৃদুমন্দ, আর একটা প্রবল। মৃদুমন্দ হাওয়ায় করে স্রষ্টার সৃষ্টিকে সতেজ, শ্যামল। আর ঝড়ের প্রবল হাওয়া করে সৃষ্টিকে ধ্বংস। সেই ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল।

হিমালয় বললে—বেশ ঝড়ই যদি হয়, তবে ঝড়েরও তো একটা ভাল দিক আছে। নীচের উত্তপ্ত হাওয়াকে উড়িয়ে নিয়ে উপরের ঠাণ্ডা হাওয়াকে চালান করে দেয়।

জগবন্ধু বললে—আমিও তো তাই বলছি। তোদেরও উড়িয়ে সেই আদিম যুগে নিয়ে ফেলেছে।

রেগে গিয়ে হিমালয় বললে—তুমি কি বলতে চাও, আমরা আদিম যুগে ফিরে গেছি!

জগবন্ধু বললে—তোদের পোশাক-আশাক চলন বলন দেখে তো আমার তাই মনে হয়। এযুগের ঝড়ো হাওয়ায় তোদের দেহ থেকে, মন থেকে, উড়িয়ে নিয়ে গেছে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, শালীনতা, মায়া, মমতা সব। অতএব—এসবই যদি গেল, তবে আর আদিম যুগের কি বাকী রইল বল্?

হিমালয় খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললে—ঠিক আছে, তোমার এই বিষয়টি আমাদের সংঘের বিতর্ক সভায় পেশ করব। তুমি সেখানে এসে তোমার বক্তব্যটাকে প্রমাণ করবে।

জগবন্ধু চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—কী বললি, তোদের সংঘের বিতর্ক সভায়?

হিমালয় বললে—হ্যাঁ।

জগবন্ধু কোনো কথা না বলে চলে যাবার উদ্যোগ করল।

হিমালয় বললে—কী, চললে নাকি? জবাব দিয়ে গেলে না?

যেতে যেতে বললে জগবন্ধু—আমার তো তোর মত মাথা খারাপ হয়নি! বলে বেরিয়ে গেল।

বাবা মা, সকলকেই হিমালয় তার স্বমতে আনতে পেরেছে, কিন্তু ব্যর্থ হ'তে হয়েছে এই জগাদার বেলায়, অনেকদিন সে ঠিক করেছে, —এই মধ্যযুগীয় লোকটির সঙ্গে সে আর কোনো কথাই বলবে না। অথচ জগাদার সামনে এলে হিমালয় যেন আর হিমালয় থাকে না। ঝরণার মতই হয়ে যায়। বোধহয় জগবন্ধুর ব্যক্তিত্বের একটা নীরব শাসন আছে। যে শাসনের সামনে হিমালয়কেও মাথা নোয়াতে হয়!

অনিমেষের বাড়ী থেকে সেদিন জগবন্ধু সোজা গণপতিবাবুর বাড়ী এসে হিমালয়কে বললে—কাল সন্ধ্যার পর এক ভদ্রলোক

আসবেন। দেখিস আগের বারের মত কেলেঙ্কারী করিসনি যেন। আমি আসতে পারব না, একটু কাজ আছে।

এই কেলেঙ্কারীর জন্যে হিমালয়ও খুব লজ্জিত। তা কি করবে? একই দিনে দু' দুজন পাত্র এল, হিমালয়কে দেখতে। একটু আগে পিছে এলেও না হয় হত। এতেই হিমালয়ের মেজাজটা গেল বিগড়ে। তারপর যখন তারা একে একে বললে—আপনাকে দেখতে এসেছি—, তখন আর হিমালয় আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। রেগে গিয়ে বললে—আগে ভাষাটা সংশোধন করুন। আমি কি সং না চিড়িয়াখানার জন্তু যে দেখতে এসেছেন?

পিলে চমকে গেল পাত্রদের। বললে—তবে কী বলতে হবে—?

হিমালয় বললে—বলুন দেখা দিতে এসেছি বা আলাপ আলোচনা করতে এসেছি।

পাত্রীর কথা শুনেই পাত্রদের স্থান কাল হারাবার উপক্রম হ'ল। তারপর হিমালয় যখন তাদের জেরা করতে আরম্ভ করল—জেরা তো নয়, যেন সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন যা কেলেঙ্কারী হ'ল, সেকথা না বলাই ভাল। মোদ্দা সেটা হিমালয়ের পক্ষে একটা গভীর লজ্জার ব্যাপার হয়েই রইল।

সেদিন সন্ধ্যার পর যথারীতি সমাজ সংস্কার সংঘের অফিসে বিতর্ক সভা বসেছে। ব্ল্যাক্‌বোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা আছে,—'অদ্যকার বিতর্কের বিষয় হ'ল—স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার হওয়া উচিত কিনা।'

আজকের বিষয়টির পক্ষে ও বিপক্ষের শ্রেণী বিভাগ করাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। মেয়েরা ও ছেলেরা স্বাভাবিক ভাবেই আলাদা আলাদা বসেছে। মেয়েদের দলকে পরিচালনা করছে—হিমালয় ঝরণা সিংহ, আর ছেলেদের দলকে পরিচালনা করছে ঘটোৎকচ তলাপাত্র।

ঘটোৎকচ তো ঘটোৎকচই। ইয়া জাঁদরেল চেহারা। কালো মিশমিশে। ডাম্বেল মুগুর ভেঁজে ভেঁজে হাত-পাগুলোও মুগুরের মত হয়েছে।

যাই হোক, ঘড়ি ধরে সাতটা পঁচিশ মিনিট সাতাশ সেকেণ্ড গতে বিতর্ক সুরু হয়ে গেল।

প্রথমেই হিমালয় ঝরণা সিংহ বিতর্কের সূত্রপাত করে এক নাতিদীর্ঘ জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে উপসংহারে এই বলে শেষ করল—স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত না হলে, আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করব।

মেয়েদের দল হাততালি দিয়ে সমর্থন করল।

উত্তর দিতে উঠে ঘটোৎকচ তলাপাত্র প্রথমেই বার দুই বুকের ছাতিটাকে একটু ফুলিয়ে নিল। দু' হাতের মাস্‌ল্ দুটো নাচিয়ে নিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতি পর্ব শেষ করল। তারপর বিকট শব্দে গলাটা পরিষ্কার করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলতে সুরু করল—আমার পূর্ববর্তী বক্তা, মিস্ হিমালয় ঝরণা সিংহ বললেন, স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত না হলে, তাঁরা বিদ্রোহ করবেন। কিন্তু আমি বলছি,—তাঁদের সমান হবার যোগ্যতা আছে কিনা, তার প্রমাণ দিন আগে। বলে ডাইনে বাঁয়ে, নিজের দলীয় লোকদের দিকে চেয়ে বসে পড়ল।

ও তরফ থেকে হিমালয় ঝরণা দাঁড়িয়ে উঠে বললে—কী প্রমাণ চান আপনি?

ঘটোৎকচ পুনরায় দাঁড়িয়ে উঠে বললে—বেশ উঠুন দেখি, এভারেস্টের চুড়োর উপরে—? আমি জানি, সেটি আর হচ্ছে না। সে তেনজিং সেরপা। আশা করি আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন—তিনি পুরুষ। বলে মেয়েদের দিকে একটা সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজের দলীয় লোকদের দিকে একবায় তাকাল। তারাও বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ওদিকে মেয়েদের দল একেবারে চুপ।

ঘটোৎকচ দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে আরম্ভ করল—না হয় উঠুন দেখি, হাওড়ার পুলের মাথায়? সেটিও আর হচ্ছে না। সে এই

ঘটোৎকচ তলাপাত্র। আমিও দস্তুর মত পুরুষ। আমি সেদিন হাওড়ার পুলের মাথায় উঠে প্রমাণ করে দিয়েছি, যে পুরুষেরা অতীতেও যেমন, বর্তমানেও তাই, আর ভবিষ্যতেও তেমনি উঁচুতেই থাকবে। বলে মাথার উপর হাতখানা উঁচু করে উচ্চ স্থানটি নির্দেশ করে দিল। বক্তব্য শেষ করে, সে দলীয় লোকদের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে বসল, যেন দিগ্বিজয় করে ফিরে এসেছে।

দলীয় লোকরাও অকৃতজ্ঞ নয়, তারাও প্রবল ভাবে করতালি দিয়ে, 'হিয়ার' 'হিয়ার' প্রভৃতি অভিনন্দন-সূচক শব্দ করে তাকে অভিভূত করে দিল। মেয়েদের দিকে চেয়ে পরস্পরের মধ্যে ইঙ্গিত বিনিময় হল।

মেয়েদের মধ্যে প্রথমে খানিকটা স্থিতাবস্থা লক্ষ্য করা গেল। তারপরেই ওদের মধ্যে একটা শলা পরামর্শ সুরু হয়ে গেল।

ছেলেদের দল ওদের এই অসহায় ভাবটা বেশ আরামের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল। কতকটা যেন বিজিতের আর্তনাদে বিজয়ীর উল্লাসধ্বনি করার মত। ছেলেদের দল তাদের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। কারণ ঘটোৎকচ পুরুষদের স্থান এত উচ্চে উঠিয়ে দিয়েছে, যে তার উপরে ওঠবার সাধ্য মেয়েদের হতেই পারে না।

ভীমপদ মেয়েদের দিকে চেয়ে, কাটা ঘায়ে, নুনের ছিটের মত করে বললে—কী! এবার যে চুপ করে গেলেন? বলবার থাকে তো কিছু বলুন। না হ'লে প্রস্তাবটি পাশ করে নিন।

মেয়েদের তরফ থেকে ক্রন্দসী চ্যাটার্জী উঠে বললে—আমাদের পক্ষ থেকে মিস্ হিমালয় ঝরণা সিংহই এর জবাব দেবেন।

পরক্ষণে হিমালয় ঝরণা সিংহ, হিমালয়ের মতই মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। এবং সিংহের মত গম্ভীর কণ্ঠে বলতে সুরু করল—বন্ধুগণ, এভারেস্টের চূড়ার উপর ওঠার সার্থকতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু হাওড়ার পুলের মাথায় উঠে বন্ধুবর মিঃ ঘটোৎকচ তলাপাত্র যে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা জানি, হাওড়ার পুলের মাথায় উঠবার প্রয়োজন একমাত্র পাগল বা হনুমান

ছাড়া কারো হ'তে পারে না। আশা করি, আমরা পাগল বা হনুমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছি না।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে হাসি ও হাত তালির হুল্লোড় পড়ে গেল। তারা সমস্বরে 'শেম্' 'শেম্' 'হিয়ার' 'হিয়ার' প্রভৃতি শব্দগুলো, ছেলেদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

ছেলেদের দল রেগে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগল—আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। হনুমান কথাটা আন্‌পার্লামেণ্টারী টক্। বরঞ্চ রামের কিঙ্কর বলতে পারেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু তাদের প্রতিবাদ ধ্বনি তখন মেয়েদের কলকাকলিতে ডুবে গেল।

ছেলেরা চেঁচিয়ে বলতে লাগল—এ অন্যায়—এ অন্যায়—।

মেয়েরা দাঁড়িয়ে 'শেম্' 'শেম্' বলতে লাগল। তার উত্তরে ছেলেরা বললে—আপনারা 'শেমলেস্' 'শেম্‌লেস্'—

ঘটোৎকচ তাড়াতাড়ি একটা গোল টুলের উপর লাফিয়ে উঠে, মুগুরের মত হ.তটা উর্ধ্বে তুলে গলা ফাটিয়ে বললে—আমরা আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করছি।

তার উত্তরে হিমালয় ঝরণা কৌচের উপর লাফিয়ে উঠে সমান ভাবে হাত নাড়িয়ে বললে—আমরা ক্ষমা চাইব না, আপনারা হেরে গেছেন, স্বীকার করুন।

তারপর সুরু হয়ে গেল দুই পক্ষের গলাবাজী, তাতে কে কাকে কী বলছে, কিছুই বুঝবার সাধ্য রইল না। মোটের উপর গণপতি সিংহের বাড়ীটা মজবুত বলে যা রক্ষা—! না হ'লে দেয়াল, ছাদ ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

পাড়ার লোক প্রথম প্রথম ছুটে আসত। এখন তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু পাড়ার কুকুরগুলোর বোধ করি সমাজ সংস্কারের এই অভিনব পদ্ধতিটা এখনো রপ্ত হয়নি। তারা এই চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে, বাইরে এসে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ সুরু করে দিল। ভিতরে হৈ চৈ, বাইরে ঘেউ ঘেউ, সবটা মিলে যা দাঁড়াল, তাতে দক্ষযজ্ঞ হার মেনে যায়।

ঠিক এমন সময়, অনিমেষ আর সরিৎ এসে ঘরের কাছে উঁকি দিল। বলাবাহুল্য, অনিমেষ গেরুয়া ছেড়ে সাদা জামা কাপড় পরেই এসেছে।

ঘরের ভেতরের এই অবস্থা দেখেই অনিমেষের চক্ষুস্থির। তার ছোট্ট বুকের ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটি ধড়াস ধড়াস করতে সুরু করল। সে সরিৎকে ফিস ফিস করে বললে—ওরে সরিৎ, চল্ ফিরে যাই।

সরিতের কিন্তু একটা বেশ কৌতূহল জাগল। সে বললে—কেন, কী হল রে—, আগে তোর বিদুষীকে ভাল করে দেখে নে।

ইতিমধ্যে সভ্য সভ্যাদের এদিকে দৃষ্টি পড়ায়, মুহূর্তে সব চুপ হয়ে গেল। হিমালয় কৌচ থেকে নেমে দরজার কাছে এসে বললে—কাকে চাই ?

অনিমেষ সরিৎকে একটা ঠ্যালা দিয়ে ইঙ্গিত করল, জবাব দিতে। কিন্তু সরিৎ মজা দেখবার জন্যে, চুপ করে রইল। অগত্যা অনিমেষই ক্ষীণকণ্ঠে বললে—এটা কি গণপতি সিংহের—

কথাটাকে টেনে নিয়ে বললে হিমালয়—হ্যাঁ, তাঁরই বাড়ী। কাকে চাই ?

অনিমেষ বললে—তাঁকেই চাই।

হিমালয় বললে—আসুন।

ওরা ঘরের ভিতর আসতেই, সভ্য সভ্যারা বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে তাদের বসতে দিল।

হিমালয় পাশের ঘরের দিকে চেয়ে ডাক দিল—বাবা—বাবা—।

বেরিয়ে এলেন গণপতি সিংহ। ভদ্রলোককে দেখলে সত্যিই মায়া হয়। মাথায় ভিজে গামছা ভাঁজ করা। দুই কানে তুলো দেওয়া, চিন্তার গুরুভারে ন্যুব্জদেহ হয়ে পড়েছেন তিনি। এসে বললেন—কী মা ?

হিমালয়, অনিমেষ ও সরিৎকে দেখিয়ে দিতেই তিনি বললেন—আপনারা— ?

এবারেও অনিমেষ চেয়েছিল সরিৎই জবাবটা দিক, কিন্তু তার তরফ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বললে—আপনার ভাগ্নে জগবন্ধু আমাকে পাঠিয়েছে— ।

যদিও সবকিছুই জানা, তবুও না জানার ভান করে গণপতিবাবু বললেন—ওঃ বস বাবারা বস। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—মা, জগবন্ধু আমাকে বলে গিয়েছিল বটে, যে এরা এলে তোমাকে যেন— ।

হিমালয়েরও এতক্ষণে সব মনে পড়ে গেল। বললে—ওঃ জগদা পাঠিয়েছেন। আপনাদের তো সাড়ে আটটায় আসবার কথা ছিল। তারপর ঘড়ি দেখে বললে—এখনো তো সাড়ে আটটা বাজতে তিন মিনিট বাকী আছে ? যাই হোক—তা—আমাকে বললেই তো পারতেন। বাবা বুড়ো মানুষ। ব্লাড প্রেসারের রুগী।

অনিমেষ এতক্ষণে একটা আলাপের সূত্র পেয়ে বেঁচে গেল। সে সহানুভূতি দেখিয়ে বললে—ওঃ আপনার ব্লাড্ প্রেসার বুঝি ?

গণপতিবাবু হঠাৎ অনিমেষের হাত দুটো খপ করে ধরে আকুল ভাবে বললেন—তুমি আমার এই ব্লাড্ প্রেসারটা কমিয়ে দাও বাবা।

অনিমেষ ও সরিৎ দুজনেই অবাক হল। অনিমেষ বললে—আমি ! আপনি বরং কোনো ডাক্তারের কাছে—

গণপতি বললেন—না—না, বাবা, এ প্রেসার কোনো ডাক্তার হাল্কা করতে পারবে না। তুমিই শুধু পার।

অমিমেষ বললে—আমি, মানে—

গণপতিবাবু বললেন—তুমি আমার এই মেয়েটির ভার গ্রহণ করলেই আমারও চাপ কমে যাবে বাবা।

গণপতিবাবুর এই আকুলতাকে সমাজ সংস্কার সংঘের সভ্য-সভ্যারা আত্ম অপমানকর বলে মনে করল। তারা পরস্পরের মধ্যে কৌতুক দৃষ্টি বিনিময় করল। হিমালয় যেন মরমে মরে গেল। সমাজ সংস্কার করতে নেমেছে সে। অথচ নিজের ঘরেই সংস্কারের অভাব। তার নিজের বাবারই যে সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন, এই কথাটাই

যেন সভ্য সভ্যারা নীরব ভাষায় ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল। তাই হিমালয় একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে—তুমি এখন ঘরে যাও বাবা। লেট্ আজ্ টক্ ফ্রীলি। গণপতিবাবু অপরাধীর মত বললেন—যাচ্ছি মা যাচ্ছি। তবে তোর ঐ 'টকের' মধ্যে একটু মিষ্টিও দিস যেন। বলে তিনি চলে যাচ্ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে ভীমপদ বলে উঠল—তা আপনার কানের তুলো ছ'টো এখন খুলে ফেলতে পাবেন কাকাবাবু। আমাদের আলোচনা আজকের মত মুলতুবী রইল।

গণপতিবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—ওঃ মুলতুবী রইল! বাঁচালে বাবা। বলে কানের তুলো ছটো খুলে ফেলে ঘরে চলে গেলেন।

হিমালয় ঝরণা এবার সভ্য সভ্যাদের অনুরোধ জানিয়ে বললে—বন্ধুগণ—আমি একটু এই ভদ্রলোকের ইণ্টারভিউটা নিয়ে নিতে চাই। আপনারা যদি কাইণ্ড্লি একটু পাশের ঘরে—

সভ্য সভ্যারা এক যোগে বলে উঠল—ওঃ সার্টেন্লি। বলে পাশের ঘরে চলে গেল।

সরিৎ অবাক হয়ে বললে—ইণ্টারভিউ— !

হিমালয় বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এইখানে বসেই আমি কেণ্ডিডেট-দের ইণ্টারভিউ নিয়ে থাকি। বলে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে, একখানা কাগজ বের করল।

সরিতের কৌতূহল ক্রমশই বাড়তে লাগল। বললে—ওটা কী?

হিমালয় বললে—এটা প্রশ্নপত্র।

অনিমেষ অসহায়ের মত একবার সরিতের দিকে চাইল। কিন্তু সরিৎ শুধু মিটি মিটি হাসতে লাগল।

হিমালয় কাগজখানা খুলে একবার দেখে নিয়ে অনিমেষকে বললে—আমার নাম হিমালয় ঝরণা সিংহ। এবার আপনাব নামটি বলুন।

অনিমেষের জিভটা ইতিমধ্যেই বারো আনা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে অস্ফুটস্বরে বললে—কাকে বলছেন—আমাকে?

হিমালয় বললে—আমার মনে হয়, আপনিই কেণ্ডিডেট ?

অনিমেষ বললে—তাই হবে বোধহয়।

হিমালয় বললে—নাম বলুন। লিখতে হবে কিনা। বলুন—বলুন।

অনিমেষ সরিতের দিকে চেয়ে বললে—বল না।

সরিৎ হেসে বললে—সে কি রে, নাম ভুলে গেলি না কি রে ? আচ্ছা বলে দিচ্ছি, ওর নাম শ্রীঅনিমেষ দত্ত।

হিমালয় লিখে নিয়ে বললে—এবার আপনি আমার গোটা কয়েক প্রশ্নের জবাব দেবেন আশা করি। দেখুন, এটার পূর্ণ সংখ্যা একশ। তিরিশ পেলে পাশ। কিন্তু আপনাকে অন্তত যাট নম্বর পেতে হবে। অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিসন্ মার্ক না পেলে চলবে না। প্রথমেই দৈহিক গঠনের জন্য যে দশ নম্বর দেওয়া ছিল, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সেখানে আপনি শূন্য পেলেন। ইউ আর ফিজিকালি টু-উ উইক্ !

সরিৎ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—দেখুন ও মেণ্টালি কিন্তু ভেরী স্ট্রং। মনের জোর যথেষ্ট না থাকলে, ও এখনো অমনভাবে নিশ্বাস টানতে পারত না।

হিমালয় ঝরণা একটু হেসে বললে—বন্ধুর জন্যে প্লিড্ করতে আসাটা, আপনার পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, পরীক্ষার ব্যাপারে এটা অচল। এটা অন্তত আপনার বোঝা উচিত। আমি দুঃখিত। বলে অনিমেষকে বললে—আচ্ছা দু নম্বর প্রশ্ন—, আপনার মাসিক আয় কত ?

অনিমেষ বললে—প্রায় সাড়ে তিনশ।

হিমালয় একটু চিন্তা করে বললে—চলতে পারে। আচ্ছা গান গাইতে পারেন ?

অনিমেষ বললে—না।

হিমালয় বললে—নাচতে পারেন ?

অনিমেষ বললে—এর আগে নাচিনি কোনদিন, এরপর হয়তো নাচতে হতে পারে।

হিমালয় একটু দৃঢ়ভাবে বললে—সোজাসুজি জবাব দেবেন। আচ্ছা চার নম্বর প্রশ্নের ক, খ, গ, ঘ, ঙর মধ্যে যে কোনো তিনটি প্রশ্নের জবাব দিলেই চলবে। আচ্ছা প্রশ্নগুলো আপনি শুনে নিন। ক—কাপড় ইস্ত্রী করতে পারেন? খ—রান্না করা? গ—বাসন মাজা—? ঘ—ঘর সাজানো? ঙ—আমি সিনেমায় গেলে ছেলে মেয়েদের রাখতে পারবেন? বলুন এবার।

অনিমেষ যতবারই সরিতের দিকে সাহায্যের জন্যে কাতরভাবে তাকাতে লাগল, ততবারই সে অন্যদিকে মুখ ফেরাতে লাগল।

হিমালয় তাগিদ দিয়ে বললে—বলুন! ওর‍্যাল পরীক্ষায় এক মিনিটের বেশী টাইম দিতে পারব না। বলুন—।

অনিমেষ বললে—ওর কোনোটাই—

হিমালয় বললে—পারেন না। আপনি দেখছি ফেলই করলেন। আচ্ছা এবার বুদ্ধির পরীক্ষা। ধরুন মাসের শেষ, আপনার হাতে পয়সা নেই, তখন আপনার স্ত্রী বায়না ধরল,—সিনেমায় যাবে। তখন আপনি কী করবেন?

সরিৎ বলে উঠল—কেন, ও তখন একটা কৌটো নিয়ে পথেঘাটে ট্রামে বাসে বেরিয়ে পড়বে, আর বলবে প্লিজ হেল্প্ মি। আমার স্ত্রী সিনেমায় যাবেন।' বলে হেসে উঠল সরিৎ।

হিমালয় চোখ কটমট করে বললে—নো টক্ প্লিজ। আচ্ছা ভারতের প্রাইম্ মিনিস্টার কে বলুন তো?

সরিৎ বললে—মনে হয়, আপনি হলেই ভাল হ'ত।

হিমালয় এবার রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠল—আপনি চুপ করুন। যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, যিনি আমার স্বামী হবেন, তিনি দামী কি রটন্ দেখে নেব না? আচ্ছা এবার কিছুটা লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। ভারত ফরেন্ পলিসীতে যত উন্নতি দেখিয়েছে, দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে তার সিকি ভাগও দেখাতে পারেনি। এর পক্ষে বা বিপক্ষে কুড়ি লাইনের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখে দিন তো। ইংরেজীতে পারলে ভাল হয়, নয় তো বাংলায় হলেও চলবে।

অনিমেষের ক্রমশই চক্ষু স্থির হয়ে আসছিল। ঘামে জামা কাপড় ভিজে গেল।

হিমালয় তাগিদ দিয়ে বললে—কই চুপ করে আছেন কেন?

সরিৎ বললে—ও এম্. এস্-সি পাশ করে একদম বোকা বনে গেছে। তাই মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না।

হিমালর বললে—হুঁ। এবার স্পোর্টস্ এণ্ড গেম। আচ্ছা, আপনি দৌড়তে পারেন?

অনিমেষ চট্ করে দাঁড়িয়ে উঠে সরু গলায় বললে—সম্প্রতি ঐ ইচ্ছাটাই আমার প্রবল হয়েছে, কিন্তু দরজা খোলা পাব ত?

হিমালয় এবার একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে উঠল—সাবধান, আমি আবার বলছি, আমি সোজা জবাব চাই।

ধমক খেয়ে অনিমেষের মাথাটা কেমন যেন বোঁ করে ঘুরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে, কৌচের উপর পড়ে গেল।

সরিৎ ও হিমালয় একসঙ্গে বলে উঠল—কী হল—কী হ'ল—?

সরিৎ তাড়াতাড়ি অনিমেষকে জড়িয়ে ধরে আকুল ভাবে বলতে লাগল—অনিমেষ—অনিমেষ—এ যে মূর্ছা গেছে দেখছি!

হিমালয় বললে—সে কি! বলে ত্রস্ত কণ্ঠে ডাক দিল—বাবা—বাবা—।

আশঙ্কাটা গণপতিবাবুর আগেই ছিল। অতএব মেয়ের ডাক শুনেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। এবং অনিমেষকে ঐরকম চোখ উল্টে পড়ে থাকতে দেখে, বলে উঠলেন—কী হল—কী হল—। বলে দ্রুত কাছে এলেন।

হিমালয় বললে—ভদ্রলোকের বোধ হয় ফিটের ব্যামো ছিল,—

শুশ্রূষারত সরিৎ বললে—না—না—আগে ছিল না, সম্প্রতি হয়েছে। অনিমেষ—অনিমেষ—, বলে ডাকতে লাগল, সরিতের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

হিমালয়ের মনটাও বিশ্রী হয়ে গেল। এখন যদি ভদ্রলোকের জ্ঞান আর নাই ফেরে! তাহলে কী হবে? অনিমেষের জন্যে

হিমালয়ের মনে একটু সহানুভূতিও জাগল।—আ-হা-হা বেচারী—! কী দুর্বল—কী অসহায়!

গণপতিবাবু ব্যস্ত ভাবে অনিমেষের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—তাই তো, ওরে পাখাটা আরো জোরে ছেড়ে দে, জল আন।

হিমালয় তাড়াতাড়ি পাখাটা ফুল স্পীডে ছেড়ে দিয়ে, দৌড়ে ঘরের ভেতর গেল।

গণপতিবাবু উদ্বেগের সঙ্গে বললেন—একবার আদিত্য কবরেজকে—ওরে কে আছিস—একটু আদিত্য কবরেজকে—

হৈ চৈ শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এল ঘটোৎকচ, ক্রন্দসী প্রভৃতি সভ্যসভ্যারা।

ঘটোৎকচ বুক ফুলিয়ে বললে—বলুন কী করতে হবে? এ্যাম্বুলেন্স্, হাসপাতাল, থানা, পুলিশ, শ্মশান কোথায় যেতে হবে—কাকে ডাকতে হবে বলুন!

গণপতিবাবু বললেন—এসব কিছুই তোমাদের করতে হবে না। তোমরা এই পাশের বাড়ী থেকে আদিত্য কবরেজকে একটু নিয়ে এস বাবারা, ছেলেটি যেন কেমন হয়ে পড়েছে! বলে অনিমেষের গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

ঘটোৎকচ বললে—আচ্ছা যাচ্ছি। ওরে আয়। ছেলের দল ঘটোৎকচের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে জল নিয়ে হিমালয় আসতেই গণপতিবাবু জলের ঘটিটা নিয়ে অনিমেষের চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতে লাগলেন এবং সরিতের দিকে চেয়ে সখেদে বললেন—এর আগেও দুটি ছেলে আমার মাকে দেখতে এসেছিল বাবা। তাদের মধ্যে একজন তো কেঁদেই ফেলেছিল, আর একজন এমন জোরে ছুটেছিল, যে পাড়ার ছেলেরা চোর সন্দেহে পিছু ধাওয়া করেছিল। তারপর মেয়ের দিকে একটা রক্তচক্ষু হেনে বললেন—মা আমার রণচণ্ডী কি না, সব সময় রণরঙ্গিনী মূর্তি হয়েই থাকে!

হিমালয় যেন লজ্জায় মরে গেল।

এমন সময়, তিনজনের হাতের উপর আসনপিঁড়ি অবস্থায় বসিয়ে, আদিত্য কবিরাজকে নিয়ে, হৈ হৈ করে এসে ঢুকল ঘটোৎকচের দল।

অর্থাৎ ঘটোৎকচের দল যখন আদিত্য কবিরাজের বাড়ী গিয়ে হানা দিল, তখন কবিরাজ মশাই দাওয়ার উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে হুকো নিয়ে তামাক খাওয়ার কসরৎ করছিলেন।

কসরৎ কথাটা বলা এই জন্যে, যে কবিরাজ মশায়ের ছিল হাঁপানীর ব্যারাম। অথচ আরাম আয়েস বলতে জীবনে যা কিছু বোঝায় তা হ'ল তাঁর এই তামাক খাওয়া কিন্তু বিনা আয়েসে কোনোদিনই তিনি এই পর্বটা সারতে পারেন নি। অতএব তামাকে একটি টান যদিও বা কোনমতে দিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় টান দেবার আগে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা তাঁকে ব্যয় করতে হয় কাশি দমন করতে। তখন তাঁর চোখ কপালে উঠে যায়, পাঁজবার হাড়গুলো দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে এবং ঐ আসনপিঁড়ি অবস্থায়ই তিনি যেন তালে তালে নাচতে থাকেন। তখন তাঁকে দেখলে এই আশঙ্কা হওয়াও বিচিত্র নয় যে, দ্বিতীয় টান দেবার আগেই হযতো কবিরাজ মশায়ের হিক্কাটান উঠবে।

কিন্তু তা হলেও, কবিরাজ মশায়ের যেমন আছে হাতযশ, তেমনি আছে রোগ ও ওষুধ নির্বাচনের অদ্ভুত ক্ষমতা।

তাই রোগী এসে আগেই বিনীত ভাবে অনুরোধ করে বলে—দয়া করে তামাকটি এখন আপনি খাবেন না কবিরাজ মশাই!

কিন্তু হলে হবে কি, রোগী হাত বাড়িয়ে দিলেই কবিরাজ মশাই হেসে বলেন—দাঁড়াও, নাড়ী দেখবার আগে জ্ঞানের দরজায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই। ব্যস্, তারপর একহাতে হুকো, আর একহাতে রোগীর নাড়ী, কাশির দমকে যেমন হুকোও ছাড়েন না, তেমনি রোগীর নাড়ীও না, ফলে কবিরাজ মশায়ের অবস্থাও যেমন সঙ্গীন হয়ে ওঠে, তেমনি রোগীরও।

ঠিক এমনি এক সঙ্গীন অবস্থায় ঘটোৎকচের দল গিয়ে হাজির। ভাগ্যি ভাল—তখন কোনো রোগী ছিল না।

তাদের দেখেই কবিরাজ মশাই বুঝেছিলেন, কোনো রোগীর ব্যাপার। কিন্তু তখন কথা বলার মত অবস্থা তাঁর নয়। শুধু হাত দিয়ে মাঝে মাঝে গলাটা চেপে ধরে, বেয়াড়া কাশিটাকে শান্ত করবার বৃথা চেষ্টা করে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন—কী ব্যাপার—কী রোগী—কোথায়—ইত্যাদি—। অর্থাৎ যথাযথ কিছু ওষুধ সঙ্গে নিয়ে যাবেন, এই আর কি।

কিন্তু ঘটোৎকচ অত ইশারা-ফিসারার ধার ধারে না। সে যা বুঝবে তা বলবে—, সামনা-সামনি—সোজা-সুজি। তাই সে একবার শুধু বললে—চলুন। তারপর একটু অপেক্ষা করে যখন কবিরাজ মশায়ের কাছ থেকে কাশি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা আদায় করা গেল না, তখন সে আর কাল বিলম্ব না করে, সঙ্গীদের হুকুম দিল—ওরে ধর্ তো রে—!

তারপর ছাদনা তলায় যেমন করে ক'নেকে পিড়ির উপরে বসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি করে কবিরাজ মশাইকে তিনজনের হাতের উপর বসিয়ে, নিয়ে এল গণপতিবাবুর বাড়ী।

কবিরাজ মশাই তখনো তেমনি কাশি দমন করতে ব্যস্ত। আর হুকোটাও তেমনি হাতে ধরা আছে। শুধু টানা-হ্যাচ্ড়ার দরুনই হোক অথবা কাশির দমকের চোটেই হোক, কল্‌কেটা হুকোর উপর থেকে বোধ হয় ছিট্‌কে গেছে। তবে ঘটোৎকচদের এদিকেও লক্ষ্য ছিল। কল্‌কেটা পড়া মাত্র, একজন সেটা তুলে এনেছে।

কবিরাজ মশাইকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে ঘটোৎকচ বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে বললে—নিন, কবিরাজ মশাইকে একদম তুলে নিয়ে এসেছি। বলেই গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল।

কবিরাজ মশাই ততক্ষণে কাশিটাকে কোনোমতে ধাতস্থ করে, হুকোর মাথার দিকে চেয়ে প্রথমেই বলে উঠলেন—ওরে আমার কল্‌কে—?

ভীমপদ বলে উঠল—এই যে—, বলে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘটোৎকচ ধমক দিয়ে বলে উঠল—খবরদার—, আগে রোগী দেখা হোক, তারপর কল্‌কে দিবি।

গণপতিবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—কবরেজ, কল্‌কের চিন্তা পরে করবে। আগে রোগী দেখো—।

কবিরাজ মশাই তখন অনিমেষের নাড়ী টিপে ধরে অচেতন অনিমেষকেই জিজ্ঞেস করলেন—বুক ধড়ফড় করা, কান কট্ কট্ করা, চোখে অন্ধকার দেখা, এসব হ'ত কী?

সরিৎ বললে—আজ্ঞে, ও আর কী করে বলবে বলুন। ও তো আর এখন ওর মধ্যে নেই।

কবিরাজ মশাই বললেন—বেশ, তুমিই বলো।

সরিৎ বললে—ওর কথা, আমিই বা কী করে বলব বলুন?

কবিরাজ মশাই এবার গম্ভীর ভাবে বললেন—হুঁ, বুঝতে পেরেছি।

গণপতিবাবু ঝুঁকে বললেন—কী—কী—বুঝতে পেরেছ?

কবিরাজ মশাই মাথা নেড়ে বললেন—দুর্বলস্য•বলা নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণঘাতকা।

সরিৎ বলে উঠল—আজ্ঞে ঘটনাটাও ঠিক তাই ঘটেছিল।

কবিরাজ মশাই উদ্‌গত কাশিটাকে দমন করে বললেন—কী—কী ঘটেছিল—?

সরিৎ বললে—ঐ যে বললেন দুর্বলের পক্ষে বলশালিনী নারী হলে, সেই নারী প্রাণঘাতকা হয়? এ ব্যাপারটাও ঠিক তাই। বলে হিমালয়ের দিকে বক্রভাবে তাকাল।

হিমালয় রাগে দুঃখে অপমানে, অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

কবিরাজ মশাই বিরক্ত হয়ে বললেন—না হে ছোকরা না। তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারনি।

গণপতিবাবু বললেন—এখন কী করতে হবে?

কবিরাজ মশাই বললেন—এর চোখে মুখে কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করতে হবে।

গণপতিবাবু বললেন—করেছি কবরেজ—করেছি।

কবিরাজ মশাই বললেন—পুনরায় করো। তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে বললেন—তা গণপতি, তোমার চাকরটি কোথায়? একটু তামাকের ব্যবস্থা—।

গণপতিবাবু বললেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—, বলে চাকরকে ডাকতে গিয়ে দেখেন যে দরজার চৌকাঠ ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে। গণপতিবাবুকে আর বলতে হল না, সে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গেল তামাক আনতে।

গণপতিবাবু অনিমেষের চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। একটু পরেই অনিমেষ চোখ মেলে তাকাল।

গণপতিবাবু আনন্দে বলে উঠলেন—এই যে বাবা, চোখ খুলেছে।

কবিরাজ মশাই গর্বের সঙ্গে বললেন—চোখ খুলতেই হবে। এ আদিত্য কবিরাজের হাতের ছোঁয়া পেলে মরা মানুষও একবার চোখ মেলে তাকায়! আচ্ছা, তোমার কী হয়েছিলো বলতো বাবা? বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন অনিমেষের দিকে।

অনিমেষ চোখ মেলে সামনে হিমালয়কে দেখেই আতঙ্কে বলে উঠল—সিংহিনীর আক্রমণ।

কবিরাজ মশাই চম্‌কে বলে উঠলেন—সে কি!

ইতিমধ্যে তামাক এসে যাওয়াতে, কবিরাজ মশাই চাকরের হাত থেকে হুকোটা নিয়ে বললেন—বেশ জটিল ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে! দাঁড়াও জ্ঞানের দরজায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই। বলে কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে ভাবতে লাগলেন।—রোগী সিংহিনীর আক্রমণে ভীত। তার মানে—মানসিক ব্যাধি। তার ফলে মস্তিষ্ক সদাই উত্তপ্ত, হৃদ্‌পিণ্ড দুর্বল—রোগীর দেহ কৃশ। অতএব পুনরায় অচৈতন্য হলে চৈতন্য আর ফিরে নাও আসতে পারে। ঔষধ—মস্তকে মধ্যমনারায়ণ তৈল, হৃদ্‌পিণ্ডের জন্যে—

ধোঁয়াটা কলকের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই কবিরাজ মশাই সেটাকে হুকোর মাথায় চাপিয়ে বললেন—মধ্যমনারায়ণ তৈল মস্তকে

দেওয়া, আর দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ডের জন্যে অর্জুনারিষ্ট—বলেই তামাকে দিলেন টান। টান দিলেন তো কাশতে আরম্ভ করলেন। কাশতে আরম্ভ করলেন তো চোখ কপালে তুললেন। শুধু তাই নয়, কাশির দমকে, হুকোটাও ছিট্‌কে পড়ে গেল। ক্রমে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, তিনি আর দম ফেলতে সময় পেলেন না। তামাকে টানটা বোধহয় একটু অতিরিক্ত জোরেই পড়ে গিয়েছিল, না হলে, এত বেসামাল তিনি হন না কখনো। কবিরাজ মশায়ের এই অবস্থার সঙ্গে বিশেষ কেউই পরিচিত নয়, তাই সকলে ঘাবড়ে গিয়ে কবিরাজ মশাইকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এমন যে রোগী অনিমেষ, সেও ·পর্যন্ত উঠে কবিরাজ মশায়ের বুকে হাত বুলাতে লাগল। গণপতিবাবু শুধু একটানা বলে যেতে লাগলেন—কবরেজ—কবরেজ—ও কবরেজ—এই রে—কবরেজেরই হয়ে গেল নাকি !

ঘটোৎকচের বৃহৎ মাথার মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি অত খেলে না। যা করবার সে চটপট সিদ্ধান্ত করে ফেলে। ঠিক এই কারণেই, পুরুষের স্থান মেয়েদের তুলনায় কত ঊর্ধ্বে তা হাতে কলমে প্রমাণ করবার জন্যে সেদিন সে হাওড়ার পুলের মাথায় উঠেছিল। অতএব সে যখন দেখল—, কবিরাজ মশায়ের যা অবস্থা, তাতে আর বেশী দেরী নেই, তখন সে অযথা সময় নষ্ট না করে সঙ্গীদের হুকুম করল—যে যার বাড়ী গিয়ে একখানা গামছা কাঁধে ফেলে, খালি পায়ে চট্‌ করে চলে এসো। আর পার যদি, একটা খাটিয়া আর কিছু ফুলও নিয়ে এস। আমি এদিকে রইলুম গতি করাবার জন্যে।

এসব ব্যাপারে ঘটোৎকচের একটা দায়িত্ব আছে। হাজার হোক সমাজসেবী তো !

এদিকে কবিরাজ মশাই সবই শুনছিলেন, সবই দেখেছিলেন, শুধু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিলেন না। তাই তিনি যখন দেখলেন—, তাঁর শবযাত্রার সবই প্রস্তুত হতে চলেছে, ফুল মায় খাটিয়া পর্যন্ত—তখন তিনি প্রাণপণে হাত নাড়িয়ে গণপতিবাবু ও

অন্যান্য সকলকে বলতে চেষ্টা করলেন যে, তাঁর .কিছুই হয়নি বা তিনি হয়েও যাননি। অতএব গামছা বা খাটিয়ার কিছুই প্রয়োজন নেই। কিঞ্চিৎ পরে তিনি এমনিতেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। বরঞ্চ হুকোটা একবার তাঁর হাতে দেওয়া হোক— ।

বলা বাহুল্য, এর পরে তাঁর হাতে হুকো তুলে দেবার সাহস আর কারুর হ'ল না এবং খাটিয়া প্রভৃতি এসে পৌঁছবার আগেই তিনি ধাতস্থ হ'লেন।

মোটের উপর কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে গিয়ে গণপতিবাবু সেদিন দু' দুটো খুনের দায় থেকে কোনক্রমে রেহাই পেয়ে গেলেন।

ট্যাক্সিতে ওঠা অবধি অনিমেষ একটা কথাও বলেনি। যে উৎসাহ নিয়ে সে এসেছিল, যাবার সময় সে হতোৎসাহ জড়ের মত হয়ে গেল।

একটা কথা সরিৎকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়ে তুলল—অনিমেষ বলেছিল, বিয়ের আগে নিজে দেখে শুনে বিয়ে করতে হয়। কথাটা ঠিকই। ভাগ্যিস অনিমেষ দেখতে এসেছিল, না হলে যে কী হ'ত, —ভাবতেই সরিৎ শিউরে উঠল। যাকে শুধু দেখেই অজ্ঞান হতে হয়, বিয়ে করলে যে অনিমেষের কী অবস্থা হত, তা ভেবে সরিতেরও জ্ঞান লোপ হবার উপক্রম হল। কিন্তু সরিতের নিজের বেলায় কী হতে চলেছে! যদিও দাদা দেখে পছন্দ করে এসেছেন, তবু তার নিজের কি একবার দেখা উচিত নয়? সত্যি কথা বলতে কি, অনিমেষের এই দৃষ্টান্ত দেখে, সে ভয়ই পেয়ে গেল। শেষে তার জীবনেও এই রকম একটি এসে হাজির হবে নাকি? নাঃ—যা থাকে কপালে, সরিৎ নিজে গিয়েই একবার দেখে আসবে। বাড়ীতে জানতে পারলে তাকে খুবই বিপাকে পড়তে হবে। তা জানবেই বা কেমন করে! সে তো যাবে গোপনে। কী ভাবে কী করতে হবে, তা তো অনিমেষই বাতলে দিয়েছে। তাতে না জানতে পারবে এ

বাড়ীর কেউ, না জানতে পারবে ও বাড়ীর কেউ। বাড়ীর আশে পাশে সুবিধামত একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। যেখানে দাঁড়িয়ে সবার অলক্ষ্যে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে। কাল বিকেলেই সে যাবে।

বড় ভারি কাজের মনোমত নক্‌সা প্রস্তুত হবার পর, যেমন এন্‌জিনীয়ারের মন স্বস্তিতে ভরে যায়, সরিতের মনটাও তেমনি স্বস্তিতে ভরে গেল।

অনিমেষের দিকে চেয়ে দেখল, সে তেমনি গুম হ'য়ে বসে আছে। গাড়ি ছুটে চলেছে। কখনো দ্রুত গতিতে কখনো বা মন্থরে। কিন্তু অনিমেষকে দেখে মনে হয়, তার মনের গতি একেবারেই থেমে গেছে। সরিৎ একটু হাসল। তারপর অনিমেষকে একটা ঠ্যালা দিয়ে বললে —কিরে, কী ভাবছিস ?

অনিমেষ বললে—কিছু না।

সরিৎ বললে—পাত্রী পছন্দ হ'ল ?

অনিমেষ তার দিকে একবার চেয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সরিৎ বললে—কেন, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বিদুষী, আধুনিকা, কতই তো তোর মুখে ফিরিস্তি শুনলাম, আমি তো ভেবেছিলাম, চৌদ্দআনা কাজ এগিয়েই আছে, এখন চার চোখে দেখাদেখিটা হওয়ার যা অপেক্ষা !

অনিমেষ গম্ভীর ভাবে বলে উঠল—ঐ জগবন্ধুকে একবার পেলে হয়— !

সরিৎ বললে—তার কী অপরাধ ? সে তো বাপু বলেইছিল, দেখলে নাকি তুই ভিরমি খেয়ে পড়বি। তা তো বাপু, অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। কিন্তু যাই বলিস, তোকে দেখে কিন্তু তার খুব পছন্দ হয়েছে !

অনিমেষ বললে—কার ?

সরিৎ বললে—কার আবার, সেই জলপ্রপাতের ?

অনিমেষ বললে—জলপ্রপাতটা আবার কে ?

সরিৎ বললে—হিমালয় ঝরণার বদলে, ওর নাম আমি জলপ্রপাত রেখেছি কিনা!

অনিমেষ বললে—চুপ কর, অন্য কথা বল।

এমন সময় সরিৎ বলে উঠল—আরে ঐ যে জগবন্ধু যাচ্ছে!

অনিমেষ বললে—তাই নাকি! এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও।

ঘ্যাচ্ করে গাড়িটা থেমে গেল, একেবারে জগবন্ধুর পিছনেই। জগবন্ধু চমকে ফুটপাথের উপর উঠে দাঁড়াল।

অনিমেষ আদেশের সুরে বললে—গাড়িতে এসে ওঠো।

জগবন্ধু হেসে বললে—এই ফিরছিস বুঝি? তা পছন্দ হয়েছে তো নিশ্চয়ই।

অনিমেষ বললে—এসো, বলছি।

জগবন্ধু গাড়িতে উঠতে উঠতে সরিৎকে বললে—তুইও গেছলি বুঝি?

সরিৎ বললে—হুঁ, গেলাম বলেই তো সব দিক রক্ষা হ'ল!

জগবন্ধু বললে—কী রকম—?

সরিৎ বললে—আমার পছন্দ কিছুটা ধার দিলাম বলেই তো, ওর পছন্দ হ'ল। ওর একার পছন্দে আর কুলিয়ে উঠতে পারছিল না কিনা! তারপর সরিৎ আগাগোড়া সব বলে গেল।

সবশুনে জগবন্ধু হেসে অনিমেষকে বললে—দূর বোকা। এতেই তুই ঘাবড়ে গেছিস!

অনিমেষ নীরবে তার দিকে রক্তচক্ষু হেনে তাকাল মাত্র।

সরিৎ বললে—তাহলে তুই কী করতে বলিস?

জগবন্ধু বললে—কেন—? ওকে যেমন প্রশ্নবাণে ধরাশায়ী হতে হয়েছে, অনিমেষও তেমনি পাল্টা বাণ মারুক। সে মেরেছে অগ্নিবাণ ও মারুক বরুণ বাণ। তাহলেই দেখবি, সব জল হয়ে যাবে।

সরিৎ বললে—এবার সোজা বাংলায় বল দেখি—।

জগবন্ধু বললে—অনিমেষও গিয়ে বলুক, যে আমারও গোটা কয়েক প্রশ্ন আছে। যেমন—আমাদের মা ঠাকুরমাদের যেমন দেখেছি

তেমনি সতী লক্ষ্মীর মত স্বামীর সংসার করতে পারবেন কিনা? শ্বশুরের পরিচর্যা, স্বামীর সেবা যত্ন, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সংসারের মান বজায় রেখে, লোক লৌকিকতা করতে পারবেন কিনা? সন্তান-সন্ততিদের প্রকৃত মানুষ করে তুলতে পারবেন কিনা? আমাদের সংসারে গিয়ে নাচবার দরকার নেই, সংঘ সমিতি করবার দরকার নেই, বক্তৃতা দেবার দরকার নেই, আবহমান কাল ঘরের বউদের যে রূপটি দেখে এসেছি সেই রকম ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাকতে পারবেন কিনা? ব্যস—তাহলেই দেখবি—, একেবারে ঢিট্ হয়ে যাবে। বলে অনিমেষকে এক ঠ্যালা দিয়ে বললে—বলি শুনতে পাচ্ছিস?

সরিৎ বললে—শুনছে—শুনছে, দেখ্না কেমন মগ্ন হয়ে শুনছে।

জগবন্ধু একটু হেসে বললে—গাড়ি থামাতে বল, নেমে যাব।

গাড়ি থামল। জগবন্ধু নেমে যেতে যেতে বললে—অনিমেষ, কাল বিকেলে বাড়ী থাকবি, আমি, যাব।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিছুদূর গিয়ে সরিৎ বললে—কিরে কী ভাবছিস?

অনিমেষ অন্যমনস্ক ভাবে বললে—উ—কী বললি?

সরিৎ হেসে বললে—বুঝতে পেরেছি, গাড়ি থামা, নেমে যাই।

সরিৎ চলে গেল। অনিমেষ ব'সে রইল এক[illegible] চুপ করে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—আপ্ কাঁহা যাইয়েগা বাবুজী?

অনিমেষ বলে উঠল—কোথাও নেহি যায়গা, এই কলকাত্তায়ই থাকেগা। বলে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

বাকী পথটা হেঁটেই চলল অনিমেষ।

পণ্ডিত মশাই যে বাড়ীতে থাকেন, সেই বাড়ীর যে বাড়ীওয়ালা—সেই নন্দ চক্কোর্ত্তী, একদিন বাড়ী থেকে উধাও হয়ে গেল। গেল তো গেলই, আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কারণটা অবশ্য দু'একদিন পরেই জানা গেল যেদিন পুলিশ এসে তার বাড়ীটা ঘেরাও করল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, পুলিশ অনেকদিন থেকেই জাল বিস্তার করছিল, কয়েকজন জালিয়াতকে ছেঁকে তোলবার জন্যে—আর সেই জালিয়াতদের পালের গোদাই হ'ল এই নন্দ চক্কোর্তী। এই দলটি টাকা জাল করত না। এরা ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজস করে, ব্যাঙ্কের চেক্ জাল করত। বিনা মূলধনে কারবারটা বেশ চলছিল ভালই। তবে হামেসাই যে এরা কৃতকার্য হ'ত, তা নয়। ন'মাসে ছ'মাসে হয় তো একটা কাজ হাসিল হ'ত। তাতেই তারা বছরের কাজ গুছিয়ে নিত।

নন্দ চক্কোর্তীর এই কারবারের খবরটা কেউ জানত না। শুধু জানতে পেরেছিল পুলিশ, আর পুলিশ যে জানতে পেরেছে, সে খবরটা জানতে পেরেছিল, নন্দ চক্কোর্তী। আর জানতে পেরেই সে রাতারাতি সটকে পড়েছে। মনে হয়, তার স্ত্রী চণ্ডীরানীও এসব জানত না। অন্ততঃ পুলিশ যেদিন বাড়ীতে এল, সেদিন চণ্ডীরানীর আক্ষেপ শুনে তাই মনে হয়েছিল।

চণ্ডীরানী রাগে দুঃখে অপমানে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে পলাতক স্বামীর উদ্দেশ্যে যে সব মধুবর্ষী ভাষা প্রয়োগ করেছিল, তা শুনে, পুলিশের লোকসুদ্ধ সকলের কানে আঙ্গুল দিতে হয়েছিল। সে শুধু একটানা পুলিশকে আকুল ভাবে অনুরোধ করতে লাগল—দোহাই পুলিশ বাবারা, আপনারা শুধু একবার মিন্‌সেকে আমার কাছে ধরে এনে দিন। তারপর শাস্তির জন্যে আর আপনাদের ভাবতে হবে না। সে ভারটা আপনারা আমার উপরই ছেড়ে দিন। শাস্তির দু'একটা নমুনাও সে শুনিয়ে দিতে কসুর করল না—যেমন, মিন্‌সেকে পেলে প্রথমেই সে তার মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবে, তারপরে আঁষবটি দিয়ে তার নাক কাটবে, শেষে যে হাত দিয়ে চেক্ জাল করত সেই হাতটা এক কোপে কেটে, নন্দ চক্কোর্তীকে একদম ঠুঁটো বানিয়ে দেবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা শেষ করে চণ্ডীরানী বুক চাপড়ে বলতে লাগল—হায়-হায় আমি

কত বড় ঘরের মেয়ে, আর আমার সোয়ামী কিনা একটা জালিয়াত! আপনারাই বলুন, এখন আমি আগুনে পুড়ে মরব—না জলে ঝাঁপ দেব!

কিন্তু পুলিশ এসব কিছুই তাকে করতে দিল না। বরঞ্চ তাকে ধমকে ধামকে, বাড়ী তল্লাসী করে, যখন কোন হদিস পেল না—তখন তারা চলে গেল। চণ্ডীরানীও মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।

কারণ নন্দ চক্কোর্তী আর যাই করুক, নিঃসন্তান চণ্ডীরানীর একটা পেট যাতে বেশ ভাল ভাবেই চলে যেতে পারে, তার জন্যে এই বাড়ীখানা ও একটি বস্তী কিনে রেখে গেছে। আর নগদও যে কিছু রেখে যায়নি এমন নয়। তবে চণ্ডীরানী তা স্বীকার করে না এই যা। সে বলে—মিন্‌সে আমাকে পথে বসিয়ে গেছে।

আসলে স্বামীর কাছ থেকে পুলিশের খবরটা জানতে পেরে, টাকা পয়সা, সোনা দানা সব গোপনে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে তার বোনের বাড়ী চালান করে দিয়েছিল।

এদিকে নন্দ চক্কোর্তীর দীর্ঘদিন ধরে কোনো খবর পাওয়া গেল না। না পেল পুলিশ, না পেল চণ্ডীরানী। অবশেষে একদিন খবর এল। সেটা নন্দ চক্কোর্তীর মৃত্যুর খবর। পুলিশ একদিন তার লাস আবিষ্কার করল। আর তার রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে জানা গেল—ভাগাভাগিতে গোলমাল হাওয়াতে দলের লোকরাই তাকে খুন করে নর্দমার ভেতর ফেলে দিয়েছে। ব্যস্, নন্দ চক্কোর্তী সম্বন্ধে পুলিশও যেমন নিশ্চিন্ত হ'ল, তেমনি চণ্ডীরানীও।

নন্দ চক্কোর্তীর যখন মৃত্যুর খবর এল, চণ্ডীরানী তখন মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খেতে বসেছিল। খবরটার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার মহিলারাও এল। তারা অপেক্ষা করে রইল, কখন চণ্ডীরানী কাঁদতে বসবে। তখন তারা তাকে সান্ত্বনা দেবে, সহানুভূতি দেখাবে, আহা উহু করে তাদের পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করে চলে যাবে এবং এই নিয়ে কিছুটা সময় সরস আলোচনায় কাটাবে। কিন্তু

চণ্ডীরানী তাদের সে গুড়ে বালি দিয়ে দিল। সে ধীরে সুস্থে খেয়ে দেয়ে, পান দোক্তা মুখে দিয়ে উঠোনে একটা মাদুর বিছিয়ে পা ছড়িয়ে বিলাপ করতে বসল। প্রথমেই সুর করে সুরু করল—ওগো তুমি কোথায় গেলে গো? ওগো দেখে যাও গো—তুমি মরেছ শুনে পাড়ার হাড়জুড়ানীরা আমাকে দেখতে এসেছে গো—চোখখাকীরা দেখ, কেমন ভাবে আমার দিকে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে আছে গো—।

পাড়ার মহিলাদের গায়ে এমন কিছু গণ্ডারের চামড়া নেই, কানেও তারা তুলো গুঁজে আসেনি। রক্তমাংসের শরীরে এই বিলাপ সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই তাদের কোমল প্রাণটি বিগলিত হবার আগেই, তারা বাড়ীর বা'র হ'য়ে গেল।

চণ্ডীরানীও মাদুরটি গুটিয়ে রেখে, সোজা গঙ্গায় চ'লে গেল। একটা ডুব দিয়ে উঠে—হাতের শাঁখা দুগাছা ভেঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বাড়ী এসে একটা টানা ঘুম দিল। তারপর বহুদিন চলে গেল।

পাড়ার লোকেরা নন্দ চক্কোর্তীর ব্যাপারটা জানতে পারলেও মুখ ফুটে কারুর কিছু বলবার সাহস ছিল না। তাদের ভয় তো আর কিছুতে নয়, ভয় চণ্ডীরানীর রসনাকে। রসনা তো নয়, যেন মা কালীর খাঁড়া। যার ঘাড়ে পড়বে—শেষ না করে ছাড়বে না।

চণ্ডীরানী নিঃসন্তানা। কিন্তু সেই অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছে, মা-মরা বোনপো গোপালকে পোষ্য হিসাবে পুষে। গোপালের মাসী বলেই সে চণ্ডীমাসী নামে বিখ্যাত হ'য়েছে। চণ্ডীমাসীর মতে গোপাল ছেলে হিসেবে হীরের টুকরো। দোষের মধ্যে একটু যা নেশা ভাঙ করে। তা করুক। ওটা দোষ হিসেবে ধরা যায় না। বরঞ্চ বলা চলে বয়সের গুণ। এতটুকু বয়স থেকে গোপালকে এত বড়টি করেছে। গোপাল যে তার চোখের মণি!

সেই গোপালকে আজ চণ্ডীমাসী দূর—দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চণ্ডীমাসীর দোষ নেই। মানুষের শরীর তো! কাল রাতে তার কানের মধ্যে একটা পিঁপড়ে ঢুকে কি অস্থির কাণ্ডই না করলে!

সারারাত হু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি! সকালবেলা যাই একটু চোখটা বুজেছে, অমনি দিলে চেঁচিয়ে ঘুমটা ভেঙে!

অবশ্য গোপালেরও খুব দোষ দেওয়া :চলে না। সকাল-বেলায় তার আবার একটা দম না দিলে—শরীরের আলস্য কাটে না। আজকে গাঁজায় দম দিয়েই তার মনে হ'ল,—হুনিয়াটা সব মিথ্যে! তার বয়স—হ্যাঁ, তা তিরিশ হ'ল বৈকি! এখনও মাসী তার বিয়ের নামটি পর্যন্ত করছে না। অতএব তার জীবনটা মিথ্যে ছাড়া আর কী? আর তার জীবনটাই যখন মিথ্যে হয়ে গেল—তখন হুনিয়াটাও মিথ্যে না হয়ে আর যায় না। তাই সে অনেক ভেবে, মাসীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে মাসীর বন্ধ দরজার সামনে এসে ডাক দিল— মাসী গো—মাসী—ও মাসী—!

ডাকটা যথাসম্ভব মিহি গলায়ই সে দিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত গাঁজা খেয়ে খেয়ে গলাটা তার বাজখাঁই ধরনের হয়ে যাওয়াতে, 'মাসী' ডাকটি চণ্ডীমাসীর কানে মধুবর্ষণ না করে অগ্নিবর্ষণ করল। সে হক্‌চকিয়ে উঠে হুয়ার খুলতেই দেখে গোপাল প্রাণপণে ডেকে চলেছে—মাসী গো মাসী—ও মাসী—

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল চণ্ডীমাসী। বললে—কী, হয়েছে কী? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি?

গোপাল চোখ বড় বড় করে একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে বললে—কখন ডাকাত পড়ল মাসী! আমি তো এইখানেই বসে!

চণ্ডীমাসী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—তাহলে অত চেঁচামেচি লাগিয়েছিস কেন?

গোপাল আবদার করে বললে—আমি বিয়ে করব মাসী।

চণ্ডীমাসী বললে—এই মরেছে! হ্যাঁরে, সকালে উঠেই বুঝি দম দিয়েছিস?

গোপাল বললে—হয় বিয়ে দাও, নয় তো গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

চণ্ডীমাসী বলল—সেই দড়িগাছাও তো আমাকেই কিনে দিতে হবে? বলি বিয়ে করে খাওয়াবি কি রে মুখপোড়া?

গোপাল একগাল হেসে বললে—তুমি যদ্দিন আছো তুমিই খাওয়াবে। তারপর তুমি মলে তো একেবারে নিশ্চিন্দি। এই বাড়ী ঘর দোর তো আমারই হবে!

চণ্ডীমাসী দাঁতে দাঁত চেপে বললে—সেই আশাতেই আছিস তাহলে?

গোপাল অনুযোগ করে বললে—আশা তো করেই আছি। কিন্তু তুমি মরছ না যে!

চণ্ডীমাসী বললে—কী বললি—আমি মরছি না যে?

গোপাল বললে—হুঁ, সেকি আর মিথ্যে! সেবার অমন সুন্দর বাতের ব্যামোতে, তুমি কেমন তালগোল পাকিয়ে হাঁটু ভাঙা দ-এর মত হয়ে গেলে! আমি ভাবলাম—যাক্ এবার মাসী টেসে গেল! বুড়ো শিবতলায় গিয়ে কত মানত্—কত প্রাথ্থনা করেছি—, হে বাবা বুড়ো শিব, তুমি আমার মাসীকে এবার কাছে নিয়ে নাও। কিন্তু ও বাবাঃ, দু'দিন যেতে না যেতেই, যমের মুখে নুড়ো দিয়ে দিব্বি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালে!

রাগে ফেটে পড়ল চণ্ডীমাসী—কী—আমি ম'লেই তোর হাড় জুড়োয় রে হারামজাদা?

গোপাল অবাক হয়ে বললে—ওই দেখ—ওই দেখ—আমি কি তাই বললাম নাকি! তুমি মলে পর—আমি মাসী গো—মাসী গো—বলে কত কাঁদব! এতটুকু কাল থেকে আমাকে লালন-পালন করেছ, আর তুমি ম'লে আমি কাঁদব না? তাই তো বলি যে মাসী, মরাব আগে আমাকে একটা বে' দিয়ে যাও। না হ'লে তোমার গোপালকে কে দেখবে—?

আগুন জ্বলতে পারে। কিন্তু তাকে নেভাবার জন্যে আবার জলও আছে। চণ্ডীমাসীর ক্রোধের আগুনেও ঐ একটি কথায় জল ঢেলে দিল গোপাল—'না হ'লে তোমার গোপালকে কে দেখাব—?'

সত্যিই তো! সে ছাড়া গোপালের আর কে আছে? আর তারও তো গোপাল ছাড়া এ সংসারে কেউ নেই। দু'জনেই দু'জনের

অবলম্বন। গোপাল যে তার সন্তানের অভাব পূরণ করেছে! গোপাল যে তার মাতৃত্ব-তৃষার জল, বুক জুড়ানো মাণিক, সাত রাজার ধন!

নরম হয়ে চণ্ডীমাসী বললে—বিয়ে তো করতে চাচ্ছিস, কিন্তু কোন্ রাজকন্যে তোর পথ চেয়ে আছে শুনি?

গোপাল এবার বত্রিশ দন্ত বিকশিত করে বললে—আছে গো, আছে।—

চণ্ডীমাসী বললে—কে?

গোপাল চোখ ইশারা করে বললে—ঐ যে, ওদিকে—বলে পণ্ডিত মশাইর ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিল।

—কে—ঐ পণ্ডিতের মেয়ের কথা বলছিস—?

গোপাল আকর্ণ বিস্তৃত হা করে বললে—হ্যাঁ—!

চণ্ডীমাসীর বাড়ীটা ইংরেজী ভাষার 'ই' (E) অক্ষরের মত। বাড়ীটির মাঝ বরাবর দেওয়ালটি থাকায়, 'ই' অক্ষরের পেট সোজা লাইনটির মত দেখায়। বাড়ীটি একতলা, এক ভাগে দু'খানা ঘর নিয়ে চণ্ডীমাসী থাকে. আর এক ভাগের দু'খানা ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তার একখানায় থাকেন সপরিবারে পণ্ডিত মশাই।

ভাড়াটেদের কাছ থেকে আলাদা থাকবার জন্যেই চণ্ডীমাসী বাড়ীটির মাঝ বরাবর একটি দেয়াল তুলে দিয়েছে। তা দিলেও, যাতায়াতের জন্যে দেয়ালের মাঝে একটি দরজা করা আ..২। বাইরে বেরোবার সদরটি চণ্ডীমাসীর অংশে রয়েছে। অতএব পণ্ডিত মশাইদের বাইরে বেরোতে হলে দেয়ালের মাঝে দরজা দিয়ে এ পাশে এসে বেরোতে হয়। কল বাথরুম আলাদা আলাদাই করা আছে। তাই চিরাচরিত কলতলীয় ঝগ্ড়াটা এ বাড়ীতে হবার কোনো সুযোগ নেই।

ঝগড়াটে বলে চণ্ডীমাসীর একটা নামডাক থাকলেও, অদ্যাবধি ভাড়াটাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার তেমন কোন সুবিধা করে উঠতে পারে নি। কারণ দুই ঘর ভাড়াটের মধ্যে রাস্তার দিককার ঘরখানিতে কোনো লোক থাকে না। সেখানা এক ভদ্রলোকের

দোকানের মালপত্র রাখার গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর অপর ভাড়াটে পণ্ডিত মশাই, নিজে অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, এবং প্রভাময়ী তাঁর সংসার নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। তার উপর এই মহিলাটিকে তিনি গোড়া থেকেই খুব সুনজরে দেখেন নি। তার ছোঁয়াচ সাধ্যমত এড়িয়ে চলেছেন। তা এ বাড়ীতে কম দিন তো হ'ল না। এক নাগাড়ে দশ বছর। সেই থেকে তিনি আজ পর্যন্ত চেষ্টা করে চলেছেন এ বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে চলে যেতে! কিন্তু হয়ে ওঠেনি। হয়ে না ওঠার কারণ হ'লো পণ্ডিত মশাই। তাঁকে দিয়ে কোনো কাজটি হবার উপায় নেই!

রুচির সঙ্গে না মিললেও তবু প্রতিবেশী হিসাবে হেসে কথাও বলতে হয়, এলে বসতেও দিতে হয়। অনুসূয়াও চণ্ডীরানীকে মাসী বলে ডাকে। এ বাড়ীতে আসে যায় কথা বলে। গোপাল চেয়ে দেখে, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে অনুসূয়ার মুখের দিকে।

গেঁজেল আর পাগল বলে সকলেই গোপালকে উপেক্ষার চোখে দেখে থাকে। অনুসূয়াও দেখে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে তার প্রতি গোপালের হৃদয়ে প্রেমের বীজ উপ্ত হয়ে উঠেছে তা অনুসূয়াই বা কেমন করে বুঝবে আর চণ্ডীমাসীই বা কেমন করে টের পাবে?

কিন্তু চণ্ডীমাসীকে বড় ভাবিয়ে তুলল গোপাল। একে তো এত দিন পর্যন্ত গোপালকে বিয়ে না করানোটা তার অন্যায়ই হয়ে গেছে তার উপর আজ যখন নিজে মুখে ফুটে একটা আবদার করেছে, তা যদি সে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার চেয়েও দুঃখের কিছু থাকতে পারে না। দেখতে যদিও সে কালো, নাকটা যদিও তার থ্যাবড়া, বয়স হ'ল তিরিশ, আকারটা ঠিক বেঁটে খাটো কুমড়ার মত, তথাপি গোপাল বড়ই সুন্দর চণ্ডীমাসীর চোখে। তাছাড়া পুরুষ মানুষের আবার সুন্দর কুচ্ছিত কী! হুঁ? কিন্তু ঐ যে সারাদিন গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করে, বোম্ শঙ্কর হয়ে বসে থাকে!

তাই অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বললে চণ্ডীমাসী—তোর মত গাঁজা-খোরের হাতে পণ্ডিত মেয়ে দেবে ভেবেছিস?

গোপাল বললে—তুমি বিয়ের ব্যবস্থা কর, আমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দেব। এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দেব।

চণ্ডীমাসী বললে—তোর বাপটা ম'ল তাড়ি খেয়ে খেয়ে, তুই ধরেছিস গাঁজা!

গোপাল মাসীকে খুশী করবার জন্যে বলে উঠল—আমিও না হয় গাঁজা ছেড়ে তাড়িই ধরব, তুই বিয়ের ব্যবস্থা কর মাসী।

চণ্ডীমাসী ঝাম্‌টা দিয়ে বললে—ম'ল যা, ওর যে পাকা দেখা পর্যন্ত হয়ে গেছে!

এক গাল হেসে গোপাল বললে—তা তুমি ইচ্ছে করলে, পাকাকে কাঁচা করতে কতক্ষণ মাসী!

এটা যা বলেছে গোপাল, লাখো কথার এক কথা। সত্যিই চণ্ডী মাসীর অসাধ্য কিছু নেই, হয়কে নয় করতে, নয়কে হয় করতে তার জুড়ি নেই। কিন্তু উপায় কি? উপায়ও একটা চট করে মাথায় এসে গেল। কিন্তু সবই না ভেস্তে যায় ঐ গেঁজেলটার জন্যে। ও যদি আজ মানুষ হ'ত, তাহলে তার দুঃখটা কী ছিল! লেখাপড়া শেখাবার কী কম চেষ্টা করেছে চণ্ডীমাসী! এই পণ্ডিতের কাছেই গোপালকে পড়তে দিয়েছিল। কিন্তু গোপাল পাঁচ বছরে পঁচিশখানা বই ছিঁড়ে ফেলেও প্রথম ভাগখানা শেষ করতে পারল না। চণ্ডীমাসী মনের রাগ মনে চেপে রেখে বললে—তুই যদি মানুষ হ'িস হারামজাদা তাহলে আজকে আমার ভাবনা ছিল কী! মুখ উঁচু করে পণ্ডিতের কাছে যেতাম না?

গোপাল হেঃ হেঃ করে হেসে বললে—মাসীর যত কথা! আমি মানুষ না কি গরু না কি?

চণ্ডীমাসী বললে—তুই গরু, গরু, মহাগরু তুই!

হয়তো বা আরো কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করত, যদি না 'মাসী' বলে ডাক দিয়ে অনুসূয়া এসে হাজির হ'ত।

অনুসূয়াকে দেখেই গোপাল হাতে তালি দিয়ে গান ধরল—'রাধে তোর তরে—কদম তলায় বসে থাকি।'

অনুসূয়া চণ্ডীমাসীকে বললে—মাসী, তোমাকে একবার মা যেতে বলেছেন।

চণ্ডীমাসী বললে—আচ্ছা, যাব মা।

অনুসূয়া যেতে যেতে একটু হেসে বললে—একটা মৃদঙ্গ কিনে নাও গোপালদা, জমবে ভাল।

চণ্ডীমাসী অনুসূয়ার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। —এমন লক্ষ্মী পিতিমে কি আমার বরাতে আছে!

গোপাল অনুসূয়ার গমন-পথের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল—অনুসূয়া অদৃশ্য হলে পর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল চণ্ডীমাসীর পায়ের উপর। বললে—তোর পায়ে পড়ি মাসী—।

সমস্ত শরীরটা যেন রী রী করে উঠল চণ্ডীমাসীর। বললে—দূর হ'—দূর হ'—দূর হ' মুখপোড়া!

গোপাল যখন দেখলে এত সব আবেদন নিবেদন তার ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন সেও আর সহ্য করতে পারল না। সে অভিমান ভরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বেশ, আমি চলেই যাচ্ছি। গোপালরে—গোপালরে বলে বুক চাপড়ে কাঁদলেও আর ফিরে আসব না কিন্তু বলে দিলাম—হুঁ। বলে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার বললে—আমি কিন্তু চললাম—

চণ্ডীমাসী দাঁত কড়মড় করে বললে—যা-না, দূর হয়ে যা না।

গোপাল বললে—তারপর কাঁদলেও কিন্তু আর ফিরে আসব না।

চণ্ডীমাসী তেমনি ভাবে বললে—তোর জন্যে কাঁদতে আমার বয়েই গেছে! মুখপোড়া কোথাকার!

বলে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কাল থেকে সরিৎ যতবার ভেবেছে—বাগবাজারে যাব না, তার চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ বার বেশী ভেবেছে—যাব। অফিসে বসে আজ শুধু ঘন ঘন ঘড়ি দেখেছে কখন পাঁচটা বাজবে। অবশেষে আড়াইটার

সময় ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে চেপে বসল। ড্রাইভারকে বললে—বাগবাজার যাবে আর এই গাড়ীতেই ফিরে আসবে।

গাড়ি যত এগোতে লাগল, সরিতের রঙীন কল্পনাও হাওয়ায় ভর করে ছুটে চলল বাগবাজারের কাঁটাপুকুর লেনের একটি বাড়ীতে—সেখানে থাকে একটি মেয়ে, যে নাকি রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—

কুঁচবরণ কন্যা যে তার,
মেঘবরণ কেশ,
আমায় নিয়ে যাও রে পবন
সেই সে কন্যার দেশ।

—একটু জোরে চালাও সর্দারজী।

ড্রাইভারকে তাগিদ দিয়ে সরিৎ গুন্ গুন্ করে গান ধরল।

বাগবাজার অঞ্চলটাকে কেন যে এত ভাল লাগতে লাগল, তা সে বুঝতে পারল না। তার মনে হতে লাগল, বাগবাজারের প্রতিটি পথঘাট বাড়ীঘর ইটকাঠ সব যেন তার আত্মীয়—আপন।

সরিৎ নিজের মনে এর একটা যুক্তি খাড়া করল।—হবে না? বাগবাজার কি আর যে সে জায়গা! কত পবিত্র! কত মহাপুরুষদের চরণ স্পর্শে ধন্য এই বাগবাজার! ওইখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আসতেন। ওইখানে স্বামী বিবেকানন্দ আসতেন, ওইখানে সিস্টার নিবেদিতা থাকতেন, ওখানেই মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বাড়ী, ওটা কত পুরোনো বনেদী অঞ্চল! বাগবাজারের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে! তার ভাগ্য ভাল—সেই বাগবাজারেই তার—

—একটু আস্তে চালাও সর্দারজী!

ড্রাইভার ভাবল, দুর্ঘটনার ভয় করছেন বুঝি বাবুজী। কিন্তু বাবুজী তো জানেন না,—যে তার হাত কত পাকা! গাড়ি তার হাতের পুতুল। যেমন খুশি ঘোরাবে, তেমনি গাড়ি ঘুরবে। গাড়ি আর দাড়ি, দুই-ই সমান তার কাছে। দাড়িকে সে যেমন যত্ন করে, গাড়িকেও তেমনি। দাড়ি তার সম্মান, গাড়ি তার প্রাণ। দাড়ি

তার ধর্ম, গাড়ি চালানো তার কর্ম। দাড়ি তার জীবন, গাড়ি তার জীবন ও জীবিকা। সে একবার দাড়িতে, একবার গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে মমতার সঙ্গে হাত বুলতে লাগল।

কিন্তু গাড়ি যতই বাগবাজারের কাছাকাছি আসতে লাগল, ততই সরিতের বুকটা অহেতুক কাঁপতে লাগল। গাড়ি এগোচ্ছে ঝক্ ঝক্ করে, সরিতের বুকটা কাঁপতে লাগল ধক্ ধক্ করে। অবশেষে বাগবাজারের কাঁটাপুকুর লেনে এসে গাড়ি ঢুকল। কিছুদূর গিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল—কেত্‌না লম্বর যাইয়েগা বাবুজী ?

সরিৎ হঠাৎ তাকিয়ে দেখল—সতেরর এক, কাঁটাপুকুর লেনের বাড়ীর দোর গোড়াতেই গাড়ি থামিয়েছে ড্রাইভার।

সরিৎ পকেট থেকে অনুসূয়ার লেখা কাগজখানা বের করে দেখল —হুঁ এই বাড়ীই। সর্বনাশ !

গোপাল সেই যে সকালে বেরিয়ে গেল আর সারাদিন বাড়ীমুখো হ'ল না,। সারাদিন কোথায় রইল—কী খেল—কী করল ! নাঃ চণ্ডী মাসীর এ হচ্ছে এক জ্বালা ! বলতেই বলে পেটে ধরা ছেলের চেয়ে পোষা ছেলের জ্বালা বেশী। তাই তো, ছেলেটা সারাটা দিন না খেয়ে কোথায় পড়ে রইল ? মাসীর পেটে কি ভাত যায়, না যেতে পারে ? ভাত আগলে বসে রইল সারাদিন, একে ওকে তাকে কত-জনকেই না জিজ্ঞেস করল ! কিন্তু কেউ গোপালের খবরটা দিতে পারল না। তারপর ঘরের মধ্যে বসে পা ছড়িয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চণ্ডীমাসী, মনে মনে গোপালের বাপকে সুদ্ধ জাহান্নমে পাঠাতে লাগল। যেমন ছিল বাপটা তেমনি হয়েছে ছেলেটা। বাপটা যেমন বোনটাকে সারাটা জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে। ছেলেটাও তেমনি এখন তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে ! ধোয়া হাত পায়, বেশ ছিল সে। কী কুক্ষণেই না ছেলেটাকে নিয়ে এল তার কাছে !

কিন্তু সে তো যেন হ'ল ! এখন গেল কোথায় ? তবে কি

আত্মহত্যা করল নাকি! ধক্ করে উঠল চণ্ডীমাসীর বুকটা। চণ্ডীমাসী জানে, ভালবাসার মানুষকে না পেলে, অনেক সময় ছেলেমেয়েরা আত্মঘাতী হয়ে মরে।

তবে কি তাই করল নাকি!

অনুতাপের অন্ত রইল না চণ্ডীমাসীর। বিয়ে করাতে কি তার অমত! কিন্তু পণ্ডিত—।

চণ্ডীমাসীর যত রাগ গিয়ে পড়ল পণ্ডিতের উপর! কেন সে অমত করবে—? তার মেয়ে এমন কি বিদ্যেধরী! না হয়, দু'পাতা লেখাপড়াই শিখেছে! গায়ের রংটা একটু ফর্সা—তা গোপালও এমন খারাপ নয় দেখতে।

চণ্ডীমাসী ঠিক করে ফেললে—ভগবান যদি ভালয় ভালয় এখন গোপালকে বাড়ী ফিরিয়ে আনেন, তবে যে-কোনো উপায়েই হোক গোপালকে এই মেয়ে বিয়ে করাবেই—করাবে।

হঠাৎ সদরে কিসের যেন একটা শব্দ হতেই ব্যস্ত হ'য়ে—গোপাল এলি—, গোপাল—, বলে দরজা খুলে বেরিয়ে এল চণ্ডীমাসী।

—গোপাল—বলে সদরে এসেই এক হাত ঘোমটা টেনে পিছিয়ে গেল চণ্ডীমাসী। —ওমা! এ আবার কে—?

সত্যিই তো, বলা নেই—কওয়া নেই, হঠাৎ যদি দেখা যায়—, দোরগোড়ায় ইয়া সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা, মুখে এক বোঝা দাড়ি গোঁফ, মাথায় একটা টাঁউস পাগড়ী বাঁধা, হাঁটুর নীচ অবধি ঝুলওয়ালা একটা হাফসার্ট গায়ে, ইয়া জাঁদ্‌রেল চেহারার একটা লোক তোয়ালে দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে ঘুর ঘুর করছে, তবে কার না ভয় হয়! হাওয়া খাবার জায়গা কি আর খুঁজে পেল না যমদূতটা!

এদিকে সরিৎ যখন দেখল একেবারে দোরগোড়ায়ই পৌঁছে গেছে, তখন সে চটপট নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। ড্রাইভারকে তো আর বলা যায় না, গাড়িটাকে একটু দূরে সরাতে। অন্য কিছু মনে করতে পারে! তার চেয়ে সে নেমে পড়ে একটা সুবিধামত জায়গা খুঁজতে লাগল। যেখানে দাঁড়িয়ে সে বাড়ীটার প্রতি লক্ষ্য রাখতে

পারবে। সরিৎ নিশ্চিত বুঝল যে ঐ যে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে, ঐ ঘরেই থাকে সে—যাকে সে দেখতে এসেছে।

কিন্তু সরিৎ কি করে জানবে যে বাড়ীটার এই অংশে অনুসূয়ারা থাকে না, থাকে স্বয়ং চণ্ডীমাসী। আর না জানার ফলেই ঘটে গেল এক অঘটন। যার জন্যে সরিৎকে মূল্য দিতে হল অনেকখানি।

ব্যাপারটা হ'ল এই—সরিৎ যখন জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত, ড্রাইভার সর্দারজী তখন হাত পা ছড়িয়ে নেবার জন্যে, গাড়ি থেকে নেমে একটু পায়চারী করে নিচ্ছিল।

এদিকে চণ্ডীমাসীর দরজা খোলার শব্দ হতেই, সরিৎ টুক্ করে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পঞ্চনদ-তীর-বাসী সর্দারজী অতশত বোঝেওনি বা বোঝবার কথাও তার নয়। সে আপন মনে গোঁফে চাড়া দিতে দিতে হাওয়া খাচ্ছিল তোয়ালে দিয়ে। এমন সময় হ'ল চণ্ডীমাসীর আবির্ভাব।

চণ্ডীমাসীর মনে অন্য সন্দেহ উঁকি দিল। সে সাহসে ভর করে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বললে—এই তুমি কে হ্যায়—?

পাঞ্জাবীদের বুলি হিন্দী নয়, গুরুমুখী। তাহলেও অন্য বুলিও তারা বোঝে, বুঝতে হয়। বিশেষ করে বুঝতে হয়, চণ্ডীমাসীর মত হিন্দীভাষীদের লঘুমুখী ভাষা।

সর্দারজী বললে—হাম্ টেক্সি ডেরাইভর আছে।

চণ্ডীমাসী বললে—তা এখানে ঘুর ঘুর করতা হ্যায় কেন?

সর্দারজী বললে—হারে এই কোঠিমে একঠো বাবুজী এল—। বলে চণ্ডীমাসীর ঘরটা দেখিয়ে দিল।

বাবুজী এল! তবে কি গোপাল এল নাকি! চণ্ডীমাসী বাড়ীর মধ্যটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখল—কই না তো! তবে—? চণ্ডীমাসী বললে—কই, আমার বাড়ীতে তো কেউ আসেনি হ্যায়? তবে কি—।

ব্যস—চণ্ডীমাসী চীৎকার দিয়ে উঠল—ওগো তোমরা কে কোথায় আছ শীগগির এস, ডাকাত এসেছে—ডাকাত—।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সর্দারজী। বললে—হেঁই—হেঁই—চীল্লাতা কিঁউ—?

আবার চীল্লাতা কিঁউ! চণ্ডীমাসী এরকম ডাকাতির গল্প অনেক শুনেছে। এই তো সেদিন নাকি দিনের বেলা পোস্ট অফিসে ডাকাতি হয়ে গেছে! সে প্রাণপণে চীৎকার দিতে লাগল।

সর্দারজী বললে—হ্যারে এত আচ্ছা তামাসা হ্যায়? তারপর দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকা, সরিৎকে দেখ বলে উঠল—হেই বাবু, উধার বৈঠকে কেয়া করতা হ্যায়? আইয়ে না ইধার!

সরিতের রোমান্স তখন শিকেয় উঠেছে! উঠে আসবে কী—হাত পা তার অসাড় হয়ে গেছে! অথচ অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে একটা কেলেঙ্কারী হতে আর দেরী লাগবে না। এক্ষুণি লোকজন ছুটে আসবে। তখন ভাবী বধূকে দেখা তো দূরের কথা, ভাবী কালেও তাকে দেখার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। চাই কি থানা, হাসপাতাল দেখা, কোনোটাই বাদ যাবে না। দৌড়ে পালাতে গেলে বিপদটা বাড়বে বৈ কমবে না। অতএব সে আত্মপ্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করল। তাই নিজেকে যেন কোনমতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল সরিৎ। আসবামাত্র ড্রাইভার বললে—এই—এই—দেখিয়ে এই বাবু—

—কই তোর বাবু কই? ঝেঁটিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দেব না?

চণ্ডীমাসীর মুখে আর হিন্দী ভাষা নেই। নেই তার মুখে ঘোমটা। আঁচলটাকে একটা পাক দিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে, দাওয়ার উপর থেকে একগাছা ঝাঁটা তুলে নিয়ে একেবারে ঝটিকা ধারিণী রণচণ্ডী মূর্তিতে দাঁড়াল।

সরিৎ এগিয়ে এসে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল—দেখুন আমি গুণ্ডা বা ডাকাত নই।

তা আর চণ্ডীমাসীকে বোঝাতে হবে না। সে তা দেখেই বুঝেছে। আর যে কথা সে বুঝেছে সেকথা এখন না বলাই ভাল।

সরিৎ দেখল এখন সত্য পরিচয়টা না দিলে কেলেঙ্কারীটা আরও

গড়াবে। তাই সে মরিয়া হয়ে বললে—দেখুন, এই পণ্ডিত মশায়ের মেয়ের সঙ্গে আমার—

তা আর বলতে হবে না। চণ্ডীমাসীর বয়সটা তো নেহাত কম হ'ল না। তারও একদিন যৌবন ছিল। সে ওসব জানে। কে কোথায়—কোন উদ্দেশ্যে কার কাছে আসে যায়—তা তার বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে পণ্ডিতের মেয়েটাও যে এই প্রকৃতির, তাই শুধু জানা ছিল না। চণ্ডীমাসী ধমক দিয়ে বলে উঠল—তবেরে, গুণ্ডামী বদমাইসীর আর জায়গা পাওনি ?

সরিৎ বোঝাতে চেষ্টা করল—তা নয়—তা নয়—

চণ্ডীমাসীর গলা শুনে পাশের ঘর থেকে প্রভাময়ী ও অনুসূয়া ডেকে বললেন—কী হয়েছে—কী হয়েছে— ?

লড়ায়ে জাত বলে পাঞ্জাবী শিখদের একটা অহঙ্কার আছে, কিন্তু সেই লড়াইবিদ পাঞ্জাবী শিখও দেখল—এ বড় শক্ত পল্টনের পাল্লায় পড়া গেছে ! পল্টনেরও রকমফের আছে। আরে বাবা লাঠি লাও, ছোরা লাও, তরয়াল লাও—নিদেন রিভল্‌বার বন্দুক লাও, তা নয় তো ঝাঁটা— ! নাঃ—পশ্চাৎ অপসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চারদিকের বাড়ী থেকে লোকজন—কী হয়েছে—কী হয়েছে বলে আসতে আরম্ভ করেছে।

এদিকে সরিৎ তখনও চণ্ডীমাসীকে আসল ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছে—দেখুন আপনি ভুল করছেন—

চণ্ডীমাসী বলে উঠল—দাঁড়া তোর ভুলটা বের করছি—ওগো তোমরা—

সর্দারজী সরিৎকে ধমক দিয়ে বলে উঠল—কেয়া দেখতা হ্যায় বাবুজী—, ছুট্ লাগাইয়েনা। বলে সরিতের হাত ধরে একটা হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। আসবার সময় চণ্ডীমাসীর সদর দরজার পেরেকের সঙ্গে বেধে সরিতের জামার পকেটটা গেল আটকে। গেলতো গেলই—পকেটটা ছিঁড়ে পেরেকের সঙ্গেই রয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সরিৎকে নিয়ে ড্রাইভার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

পরক্ষণেই ওপাশ থেকে এসে পড়ল প্রভাময়ী ও অনুসূয়া, আশে পাশের বাড়ী থেকে এল আরও দু'চারজন। সকলের মুখেই এক কথা—কী হয়েছে? চণ্ডীমাসী আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বললে— ওরে টেক্‌সি নিয়ে ডাকাত এসেছিলো গো—।

ঠিক সেই মুহূর্তে গোপাল এসে ঢুকল। সে 'ডাকাত' কথাটা শুনেই বলে উঠল—কই ডাকাত কই—ভয়কি মাসী আমি আছি—। বলে চণ্ডীমাসীর পেছনে গিয়ে লুকলো।

কিছুক্ষণ হৈ হুল্লোড় করে যে যার ঘরে চলে গেল। সকলেই চণ্ডীমাসীর অদ্ভুত সাহসের প্রশংসা করে গেল। ডাকাতদের ট্যাক্সি করে পালাতে দেখেছে কেউ কেউ একথাও বললে। কেউ বললে— তারা যাবার সময় রাইফেল উঁচিয়ে ছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটের উপর চণ্ডীমাসীর সাহসিকতার ফলেই যে আজ পাড়াটা বড় রকমের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করল।

সবচেয়ে প্রশংসা করে গেল গোপালের। গোপাল যেভাবে চণ্ডীমাসীকে সাহস দিতে গিয়ে নিজে মাসীর পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল, তার নাকি কোনো তুলনাই হয় না। এই রসিকতায় সকলে আবার এক চোট হেসেও নিল।

যাই হোক সকলে চলে যাবার পর, পেরেকে আটকে থাকা— সরিতের জামার অংশটুকু, চণ্ডীমাসী সযত্নে তুলে রেখে দিল। ভবিষ্যতে প্রয়োজন বোধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা যাবে।

দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে কিছুদূর এসে সর্দারজী জিজ্ঞেস করলে— কাঁহা যাইয়েগা বাবুজী—। ফিন্ ডালহৌসী—?

মাথা তুলে সরিৎ ক্ষীণকণ্ঠে বললে—আমাকে নিমতলা নিয়ে যেতে পার সর্দারজী—?

আজ যে ঘরের মেয়ে, কাল সে অন্য ঘরের ঘরণী। দশমাস

দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল, সে ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, তার প্রতি মায়ের সমান মমতা, সমান স্নেহ। সন্তান, সন্তানই।

খাইয়ে পরিয়ে লালন পালন করে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি দিয়ে রক্ষা করে বড় সড়টি করে সাজিয়ে গুছিয়ে, মেয়েকে পরের হাতে তুলে দিতে হবে।

বাপ মায়ের কাজ যেন কতকটা বাগানের মালীদের কাজের মত। গাছের চারাটিকে অঙ্কুর থেকে নানারকম পরিচর্যা করে বড় করে অপরের কাছে বিক্রী করে দেওয়া। ক্রেতার বাগানটিকে সেই গাছটি ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করে তুলবে। আবার সেই গাছ থেকে চারা জন্মাবে, তা আবার এই ভাবে আর এক বাগানে স্থান পাবে। এই ভাবেই চলে এসেছে সংসারের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত গতিতে। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। অন্যথা হ'লেই বলা যায়, ব্যতিক্রম।

সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হ'ল—আত্মার অধিক যে আত্মজা, গোত্রান্তর করে দেবার পরই সে হয়ে গেল পর। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর, স্বামী-গৃহে যাত্রার পূর্বে, সে স্বামীর দেওয়া একটি টাকা, কিছু ধান ও কিছু ইঁদুরের মাটি, মায়ের আঁচলে বেঁধে দিয়ে মায়ের কানে কানে বলে—'এতদিন যে তোমরা আমাকে খাইয়েছ পরিয়েছ, সেই ঋণ আমি পরিশোধ করে গেলুম।' এই সত্যটাই যেন প্রমাণ করে যে—মেয়ে আসলে পরের সম্পত্তি। বাপ মা কিছুদিনের জন্যে খবরদারি করল মাত্র। কথায়ই বলে—'মেয়ের নাম ফেলী, যমে নিলেও গেলি আর পরে নিলেও গেলি।'

বিয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, প্রভাময়ীর বুকটাও তত ভেঙে যেতে লাগল। প্রভাময়ীর শুধু থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল অনুসূয়ার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়। ছোটবেলায় অনু কখন কী করেছিল, কখন কী বলেছিল—কবে দুষ্টুমীর জন্যে প্রভাময়ীর কাছ থোক বকুনী খেয়েছিল। সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়তে লাগল—আর পাঁচজন সমবয়সীদের দেখে—অনুও নানান

জিনিসের জন্যে আবদার ধরত, কিন্তু তার অনেকটাই পূরণ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, নিজেদের আর্থিক অক্ষমতা ঢাকতে গিয়ে, অনুকে তিনি মেরেছেন পর্যন্ত। একবার অনুসূয়ার ছোটবেলায় এক কঠিন অসুখ হয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারের ফর্দ আনুযায়ী না পেরেছিলেন ওষুধ খাওয়াতে—না দিতে পেরেছিলেন কোনো ভাল পথ্য। ভগবান রেখে না গেলে আজ আর অনুকে পাওয়া যেত না। চারটে ভাতই কি সময় মত পেট ভরে খেতে দিতে পেরেছেন? তখন পণ্ডিত মশাইর চাকরীর প্রথম অবস্থা।

প্রভাময়ী এসব কথা ভাবেন, আর গোপনে চোখের জল মোছেন। সেই অনু, আর দুদিন বাদে পর হয়ে যাবে! ভাবতেও যেন কেমন বুকটা চ্যাঁৎ করে ওঠে। অথচ সে যাবেই। যেতেই হবে—যেতে হয়। আর এই পরের হাতে তুলে দেবার জন্যেই তো পণ্ডিত মশাইর আর তাঁর চোখে ঘুম ছিল না।

মেয়ে শুধু জ্বালা দিতেই আসে, শত্রু—শত্রু—মহাশত্রু। অথচ চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রভাময়ী দিনে রাত্রে অন্ততঃ পাঁচশ বার বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেন—যেন মেয়েকে সেই পরের হাতে তুলে দেবাব শুভ লগ্নটিতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

পণ্ডিত মশাইর মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝবার উপায় নেই। তিনি স্কুলে যান—আসেন। টিউশনি করেন, বাদ বাকী সম- ্কু প্রভাময়ীর ফরমাস অনুযায়ী কাজ করে যান। শুধু অনুসূয়া তাঁর সামনে পড়ে গেলে, চট করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, অন্য কোনো কাজের ছল করে উঠে যান।

অর্থহীনদের জীবন সত্যই অর্থহীন। এই প্রগতি ও সাম্যবাদের যুগেও দেশের সমাজদেহে ধনী দরিদ্র কথাটি দুষ্টক্ষতের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। এদের সাধ আছে অর্থবানদের মতই কিন্তু সাধ্য নেই কিছু করার। সমস্যার পর সমস্যা—সমস্যার পাহাড় দিয়ে যেন তাদের কপাল চাপা। একটার কোনোমতে সমাধান হ'ল তো আর একটা এসে সামনে দাঁড়াল।

বিয়ের কাপড় চোপড় যদিও বা কেনা হ'ল, কিন্তু বাসনপত্র কিনবার টাকা নেই। যদিও শেখর বলে গেছে, শুধু পাঁচটি হরতকী আর শাঁখা সিঁদুর দিয়েই বিয়ে দিতে, তবু বাপ মায়ের তো একটা কর্তব্য আছে—একটা সাধ আহ্লাদ আছে! মেয়েকে সাজিয়ে পরিয়ে বিয়ে দিতে কার না ইচ্ছা হয়! তা গয়না তো দূরের কথা, দু'টো বাসনপত্রও যদি সঙ্গে না দিতে পারা যায়, তবে লোকেই বা বলবে কী আর তাদের মনকেই বা সান্ত্বনা দেবে কী করে?

তাই পণ্ডিত মশাই স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে কিছু টাকা আগাম স্বরূপ চেয়েছেন। আজ সেটা দেবার কথা। পণ্ডিত মশাই অমনি স্কুল ফেরত বাজার থেকে প্রভাময়ীর ফর্দ অনুযায়ী বাসনপত্র কিনে নিয়ে আসবেন।

প্রভাময়ী রান্নাঘরে অনুর জন্যে দুধ জ্বাল দিতে দিতে সেই কথাই ভাবছেন। কি জানি, যদি টাকা না পাওয়া যায় তাহলে কী হবে? তাছাড়া শুধু বাসনপত্র কেনাই তো নয়, বিয়ের দিন এদিকেও তো কিছু খরচ আছে!

দুধটা বাটিতে ঢেলে অনুর খোঁজে ঘরে এসে দেখেন, অনু নেই। কোথায় গেল! এদিক ওদিক খুঁজে ডাক দিলেন—অনু,—অনু গেলি কোথায়?

কলতলা থেকে অনু সাড়া দিল—এই যে আমি এখানে মা।

প্রভাময়ী কলতলা গিয়ে দেখেন,—অনুসূয়া এক রাশ কাপড় জামায় সাবান মাখছে বসে বসে। প্রভাময়ী ধমক দিকে বলে উঠলেন—কী করছিস তুই?

অনুসূয়া বললে—কাপড় জামাগুলো কেচে দিচ্ছি মা।

প্রভাময়ী বললেন—কে বলেছে তোকে এসব করতে, রেখে দে—রেখে দে বলছি!

অনুসূয়া বললে—কেন, কাপড় কাচলে কী হয়?

প্রভাময়ী বললেন—কী হয়, সে খবরে তোর দরকার নেই। নে এই দুধটুকু খেয়ে নে দেখি।

অনুসূয়া কাতর ভাবে বললে—কত আর খাব বলতে পার? সকাল থেকে রাত অবধি তো খেয়েই চলেছি।

প্রভাময়ী বললেন—হ্যাঁ, খাবি।

অনুসূয়া বললে—আর কোনো কাজ করতে পারব না?

প্রভাময়ী বললেন—না। তারপর রাজ্যের স্নেহ মমতা দুধটুকুর সঙ্গে মিশিয়ে অনুসূয়ার মুখের সামনে ধরে বললেন—ওরে দু'দিন পরে তো সেই ঘানির গাছে জুড়তেই হবে! ও তুই এখন বুঝবিনি।

অনুসূয়া দুধটা খেতে যাবে, এমন সময় সেখানে লাফাতে লাফাতে এসে উপস্থিত হ'ল পিণ্টু। সে এসেই দিদিকে দুধ খেতে দেখে সখেদে বললে—তোর মত, আমারও যদি বিয়ে হ'তরে দিদি!

অনুসূয়া হেসে বললে—তাহ'লে কী হ'ত?

পিণ্টুর মনে এই মুহূর্তে যে কথাটা হচ্ছে সেটা সে খোলাখুলিই বলে ফেলল। বললে—তাহলে আমিও এমনি ভাবে কত খেতে পারতাম!

প্রভাময়ী হেসে বললেন—দুষ্টু ছেলে! তোকে বুঝি দেওয়া হয় না?

পিণ্টু বললে—দাও, তবে দিদিকে এত আর আমাকে একটুখানি। বলে দুজনের পরিমাণের পার্থক্যটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল।

অর্ধেকটা দুধ খেয়ে বাকীটা পিণ্টুর মুখের সামনে ধরে অনুসূয়া হেসে বললে—নে, তা তোর বিয়ে না হলেও খেতে পারবি।

প্রভাময়ী হেসে চলে গেলেন ঘরে। ঘরে এসে দেখেন পণ্ডিত মশাই জামা খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছেন। প্রভাময়ী আশে পাশে একটু চেয়ে দেখে পণ্ডিত মশাইকে বললেন—কী হ'ল?

পণ্ডিত মশাই বললেন—সব মাটি হয়ে গেল!

ধক্ করে উঠল প্রভাময়ীর বুকটা। পণ্ডিত মশাই একেবারে খালিহাতে ফিরেছেন, বাসনপত্র কিছুই আনেন নি। বাবার গলার আওয়াজ পেয়েই অনুসূয়া ও পিণ্টু এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। প্রভাময়ী বিরক্ত হয়ে বললেন—কী সব আবোল তাবোল বকছ?

শিউরে উঠল অনুও। বললে—টাকা হারিয়ে ফেলেছ বাবা?

প্রভাময়ী নিজকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে ভারি গলায় বললেন—না, স্কুল থেকে টাকা পাওনি?

তার উত্তরে পণ্ডিত মশাই অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন—সে সব কিছু নয়,—এই নাও তোমার টাকা। বলে কোঁচার খুঁট খুলে টাকা দিলেন। বললেন—গুণে দেখ। প্রভাময়ী গুণে দেখলেন সবই ঠিক আছে। বললেন—তবে?

পণ্ডিত মশাই বললেন—সব মাটি করলে ঐ শেখর!

প্রভাময়ী অবাক হয়ে বললেন—কেন, শেখর কী করলে?

পণ্ডিত মশাই মোড়াটা টেনে যুত হ'য়ে বসে অনুকে বললেন—একটু তামাক ভরে আন তো মা।

অনু চ'লে গেল তামাক আনতে। পণ্ডিত মশাই বেশ খুশির সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন—আরে আমি বাসনের দোকানে বসে বাসন কিনছিলাম। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত শেখর।

প্রভাময়ী বললেন—তারপর?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আমাকে প্রণাম করে বললে—এসব আপনি কিনছেন কেন? সে হবে না। আপনার কাছে যে ঋণে ঋণী আছি, তাতে ওসব দিলে তো ঋণ আরও বাড়বে শুধু।

প্রভাময়ী বিরক্তির সঙ্গে বললেন—তা তুমি কী বললে?

পণ্ডিত মশাই বললেন—আমি বললাম, এসব না নিয়ে গেলে—বলে প্রভাময়ীর দিকে চেয়ে থেমে গেলেন।

প্রভাময়ী বললেন—কী—থেমে গেলে কেন?

পণ্ডিত মশাই ঝপ করে বলে ফেললেন—বললাম, তুমি আমাকে গালমন্দ করবে।

প্রভাময়ী রেগে গিয়ে বললেন—একথা তুমি তাকে বললে!

পণ্ডিত মশাই বললেন—হুঁ বললাম! কেন, মিথ্যে বলেছি?

থ' বনে যাবারই কথা! কিন্তু প্রভাময়ী এখন আর অবাক হন না। কারণ তিনি ভাল করেই জানেন, যে এই সরল আত্মভোলা

সদাশিব লোকটি, কোনদিনই সংসারের ছলাকলা বুঝলেন না। সংসারের সকলকেই তিনি আপন ভাবেন। আর আপন যখন একবার ভাবাই গেল, তখন তার কাছে সব উজাড় করে বলতে বাধা কী? অতএব পণ্ডিত মশাই যে ওই কথা শেখরকে বলতে পারেন, এ অবিশ্বাস্য হলেও প্রভাময়ী বিশ্বাস করলেন। তিনি শুধু রাগে দুঃখে লজ্জায় বললেন—তা বলবে বৈকি! শেখর তার যোগ্য উদারতা দেখিয়েছে। আর তুমি সেকথা শুনে, না কিনেই চলে এলে? আমাদের সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, ঐ একটি মাত্র মেয়ে, তাকে কি শুধু ফুলে জলে দিতে প্রাণে সয়? আমাদের কষ্ট? ও তো চিরকালই আছে! শেষের দিকে প্রভাময়ীর কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এল।

পণ্ডিত মশাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে বললেন—আহা—হা, সেকথা তো আমি বলেছি, কিন্তু শেখর যে বললে•যদি শুধু পাঁচটি হরতকী দিয়ে বিয়ে না দিচ্ছি তো ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে! তাই তো আমি ভয় পেয়ে—।

প্রভাময়ী বললেন—না কিনেই বাড়ী চলে এলে! বেশ করেছ!

পণ্ডিত মশাই বললেন—কেন, তুমিই তো শেখরের হাত ধরে সেদিন বলেছিলে, আমরা মেয়েটি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না।

প্রভাময়ী রেগে গিয়ে বললেন—বলেছি বেশ করেছি। ওঃ! কত জমিদারী আছে যে দু'হাত ভরে দেবে!

রেগে গেলেন পণ্ডিত মশাইও। বললেন—তাহ'লে আমিও যা বলেছি বেশ করেছি। বলে রাগটা সামলাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার উপর গিয়ে বসলেন। অনুসূয়া হুঁকোটা নিয়ে এল। তাতে গোটা দুই টান দিতেই মাথায় যেটুকু গরম জমা হয়েছিল তা ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। তারপর এক গাল হেসে বললেন—কিন্তু যাই বল, মায়ের আমার কপালটি বড় ভাল গো! প্রজাপতি যেন হাত ধরে রাজপুত্রকে নিয়ে এলেন গো!

প্রসঙ্গ বদল হ'ল। আর এমন একটি প্রসঙ্গ, যার জন্যে এতদিন পণ্ডিত মশাই আর প্রভাময়ীর কারো চোখে ঘুম ছিল না। অতএব

ঝগড়াটা মুলতবী রেখে প্রভাময়ী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলতে বলতে দাওয়ার উপর এলেন—হ্যাঁ গা দেখতে বুঝি—

অনুসূয়া যদিও মাথা নীচু করে ঘরের মধ্যে চলে গেল। কিন্তু কান ছ'টো তার খাড়া হয়ে রইল সতর্ক প্রহরীর মত। বাবা মায়ের আলোচনার একটি বর্ণও যেন শুনতে বাদ না পড়ে। সে ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজার আড়ালে কান পেতে দাঁড়াল।

পণ্ডিত মশাই গর্বের সঙ্গে বললেন—ওতে আর বুঝি টুঝি নেই। ঐ যা বললাম—রাজপুত্র, ঠিক তাই। পাঁচ জায়গায় বুক ফুলিয়ে দেখাবার মত তোমার জামাই হবে। দেখে নিও। বলে ফুরুক্ ফুরুক করে তামাক টানতে লাগলেন।

এদিকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে, অনুসূয়া শত চেষ্টা করেও হৃদপিণ্ডের দ্রুত ওঠা-নামাটা রোধ করতে পারছিল না।

প্রভাময়ী বললেন—একটু বল না গো পরিষ্কার করে!

পণ্ডিত মশাই বললেন—এর আর পরিষ্কারের কী আছে? যেমন নাক মুখ চোখ, তেমনি গায়ের রং যেন ছুধে আলতা। তার উপর এম্. এস্-সি পাশ। ভাল চাকরী করে, রাজপুত্রের আর বাকী রইল কী বলো?

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অনুসূয়া বর্ণনাগুলো ছ' কান দিয়ে শুনছে, কিন্তু অনুসূয়ার মনে হতে লাগল সে ছ'চোখ দিয়ে দেখছে।

প্রভাময়ী হাত জোড় করে বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন—এখন ভগবানের ইচ্ছায়, শুভক্ষণে ছ'হাত এক করতে পারলেই হয়। ঠাকুর করেন, যেন কোনো বিঘ্ন না হয়।

—কিন্তু, বলে পণ্ডিত মশাই মাথা নীচু করলেন। তাঁর চোখ ছুটো ছল ছল করে উঠল। বললেন—কিন্তু আমি যে ভাবতেই পারি না, ছু দিন বাদে অনু আমার ঘরে থাকবে না, আমার ছাতি লাঠি এগিয়ে দিতে কেউ থাকবে না। আমার মা বলে ডাকবার কেউ থাকবে না—আর বলতে পারলেন না। ছু' চোখ ছাপিয়ে জল বেরিয়ে এল।

প্রভাময়ী আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে কী যেন বলতে গেলেন কিন্তু বলা হ'ল না—কই গো অনুর মা—বলে হাঁক দিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল চণ্ডীমাসী।

চণ্ডীমাসী আসতেই পণ্ডিত মশাই হুঁকোটা নিয়ে ঘরের ভেতর গেলেন। অনুসূয়াও দরজার আড়াল থেকে চলে গেল। চণ্ডীমাসীকে দেখে অনুসূয়ার মনে হতে লাগল—যেন কমল বনে একটা মত্ত মাতঙ্গ এসে ঢুকল। প্রভাময়ী বললেন—এই যে এসো দিদি। বলে দাওয়ার উপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিলেন।

চণ্ডীমাসী বসতে বসতে বললেন—হ্যাঁ, আসতে খবর পাঠিয়েছিলে, তা আসতে কি পারি? পা বাড়াতে গেলেই সতের ঝামেলা! তার উপর বিকেল বেলা কী কাণ্ডই না হ'ল! তা কী ব্যাপার বলো?

প্রভাময়ী অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন—এ মাসেও ভাড়াটা আমরা দিতে পারব না দিদি।

চণ্ডীমাসী চোখ মুখ অন্ধকার করে বললে—তা কী করে হয় বাছা! তোমরা পাঁচজনে দিলে তো আমার চলবে। আমার আর তো কোনো রোজগার নেই। এই বাড়ী ভাড়াই তো সম্বল। তোমরা বলবে দিতে পারব না, বস্তীতে তো ঠাঁই নিয়েছে কতকগুলো হাড় হাবাতে, তারা বলবে সংসারই চালাতে পারছি না, কোত্থেকে ঘরভাড়া দেব? বলি আমি কার দোরে যাব বলতে পার? তার উপর এই নিয়ে তোমাদের চার মাসের ভাড়া জমল। না-না বাছা, যে ভাবেই হোক এ মাসেই সব মিটিয়ে দাও।

এক কথায় যে হবে না, তা প্রভাময়ীও জানতেন। তিনি বললেন—তোমার ভাড়া না দিয়ে পালাব না। তা ছাড়া তুমি তো জানো, অনুর বিয়েটা হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। তাই—

এই নরম কথায় চণ্ডীমাসীর মন ভিজবার নয়। সে তেমনি মেজাজের সঙ্গেই বললে—না দিয়ে পালাবে না তা জানি। কিন্তু এত টাকা একসঙ্গে দেবেই বা কোত্থেকে বলো?

প্রভাময়ী একটু আহত কণ্ঠে বললেন—যেখান থেকেই হোক, তোমার ভাড়া পেলেই তো হয়!

চণ্ডীমাসী বললে—পেলে তো হয়, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় সেইটিই তো কথা অনুর মা! তারপর গলার স্বরটাকে রহস্যময় করে বললে—সে কথা যাক, আমি বলি কি, বাড়ীভাড়া যাতে আর কোনো দিনই না দিতে হয়, এরকম ব্যবস্থায় রাজী আছো কিনা?

প্রভাময়ী বললেন—কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না দিদি।

চণ্ডীমাসী এবার আসল কথাটা বলে ফেললে—অনুকে আমার ঘরেই দাও না।

কথাটা আরও রহস্যময় বলে ঠেকল প্রভাময়ীর কাছে, তিনি সংশয় ভরা কণ্ঠে বললেন—তোমার ঘরে মানে?

চণ্ডীমাসী গলায় বেশ জোর দিয়ে বললে—কেন গোপাল কি আমার অপাত্তর?

হতবাক হয়ে গেলেন প্রভাময়ী। এই রকম একটা প্রস্তাব যে কোনোদিন তাঁর শুনতে হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। পণ্ডিত মশাই ঘরের মধ্যে বসে তামাক খেতে খেতে সবই শুনছিলেন। তিনি কিন্তু চণ্ডীমাসীর এই কথাটাকে রসিকতা বলেই মনে করলেন। তিনিও রসিকতার ছলেই বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন—কে, গোপাল? আরে ওতো আমার কাছে 'ক' লিখতে কলমই ভেঙেছে পঁচিশটা—তা ছাড়া ও যে এখন আবার 'গ' কারে মন দিয়েছে কিনা!

চণ্ডীমাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েই এসেছে। তূণ থেকে একটি অস্ত্র ত্যাগ করল। বললে—তা কলম ভাঙলেও, আর 'গ' কারে মন দিলেও, এই বাড়ী ঘর দোর আমি গোপালকেই দিয়ে যাব কিনা!

পণ্ডিত মশাই তেমনি ভাবে হাসতে হাসতে বললেন—তাহলে গোপালকে বাদ দিয়ে, তোমার ঐ বিষয় সম্পত্তির সঙ্গেই অনুর বিয়েটা দিতে বলছ?

চণ্ডীমাসী এবার তার দ্বিতীয় অস্ত্র ত্যাগ করল। বললে—তা

মাস মাস ঘরভাড়া দেবার মুরোদ যাদের নেই, তাদের পাত্তরের দিকে না তাকিয়ে, এই দিকে তাকালেই তো ভাল হয় পণ্ডিত!

তামাকে টান দিতে গিয়ে পণ্ডিত মশাই চকিতে চণ্ডীমাসীর দিকে তাকালেন। প্রভাময়ী নিজেকে সামলে নিয়ে একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন—ঠিকই বলেছ দিদি। তা ছাড়া গোপাল আমাদের এমন কিছু অপছন্দেরও নয়। তবে কি জানো, এদিকে যে পাকা দেখা হ'য়ে গেছে কিনা?

চণ্ডীমাসী দেখল, অস্ত্রে অনেকটা কাজ হয়েছে, সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললে—তোমাদের যদি মত থাকে, তবে পাকাকে কাঁচা করতে কতক্ষণ! আরে তোমরা যেখানে সোমন্দ করেছ, সেই বাড়ীর পাশেই তো আমার বোনের বাড়ী। সে ভার তুমি আমার উপরই ছেড়ে দাও। দেখ, এসব কথা আমি বলতাম না, কিন্তু এদিকে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়েছে কিনা। তারপর গলা খাটো করে বললে—আরে ওদের দু'জনের যে ভালবাসা হয়েছে! ম'ল যা—! বলে ফিক্ করে হেসে ফেলল।

সর্বাঙ্গ রী রী ক'রে উঠল প্রভাময়ীর। কিন্তু এবারও তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—তাই নাকি?

চণ্ডীমাসীর উৎসাহের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলল। বললে—আমিও কি ছাই এসব জানতাম? গোপালই আমাকে সব বললে কিনা? সে তো গোঁ ধরে বসেছে, হয় সে অনুবে বিয়ে করবে, নয়তো গলায় দড়ি দেবে। তা দেখ, সোমত্থ ছেলে, মনের দুঃখে যদি এদিক ওদিক একটা করেই বসে, তাহলে আমার উপায়টা কী হবে বলতে পার? পেটে না ধরলেও, গোপাল যে আমার চোখের মণি!

আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না প্রভাময়ী। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—পেটে না ধরেও গোপাল তোমার চোখের মণি, আর আমি পেটে ধরেছি বলেই কি অনু আমার দু' চোখের শূল হয়ে দাঁড়িয়েছে দিদি, যে জেনে শুনে আমি তাকে জলে ভাসিয়ে দেব?

মস্ত বড় একটা হোঁচট খেল চণ্ডীমাসী। এবার সে নিজমূর্তি ধারণ করে বললে—ওঃ, আমার গোপালের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা জলে ভাসাবার সামিল হ'ল! তা কথাটা একেবারে মন্দ বলনি অনুর মা। তোমার মেয়ের যে রকম রীত-প্রকৃত দেখছি, তাতে—

গর্জে উঠলেন প্রভাময়ী। বললেন—মুখ সামলে কথা বলো দিদি।

চণ্ডীমাসী এবার তার সর্বশেষ অস্ত্র ত্যাগ করল। বললে—মুখ আবার সামলাব কি লা! যা চোখে দেখেছি, তাই বলছি। আজ বিকেলে যে চেঁচামেচিটা করলাম, তা কি অমনি অমনি! ট্যেক্সি নিয়ে এক ছোঁড়া এসেছিল না? সে তো স্পষ্টই বলে গেল যে, তোর মেয়েকে নিয়ে উধাও হবার জন্যেই সে এসেছিল। কেলেঙ্কারীর ভয়ে এতক্ষণ আমি কাউকে কিছু বলি নি। তা যখন মুখ খোলালেই অনুর মা, তখন বলছি—এসব অনাচার আমার বাড়ীতে বসে চলবে না—চলবে না—চলবে না, বলে দিলাম—হ্যাঁ।

পণ্ডিত মশাইর দেহটা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। তিনি কোনোমতে বললেন—তুমি এখন মানে মানে বিদায় হও দেখি। যাও—যাও এখান থেকে—।

চণ্ডীমাসী বললে—কী মারবে নাকি? আচ্ছা আমিও দেখে নেব কী করে বিয়েটা দাও। বলে চলে যাচ্ছিল।

এদিকে ঝগড়া শুনে, পিণ্টু পড়া ফেলে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। অনুসূয়া দরজার চৌকাঠ ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পিণ্টু চট্ করে পকেট থেকে লাট্টুটা বের করে চণ্ডীমাসীর নাকের ডগার কাছে লম্বা করে নিতে লাগল আবার গুটাতে লাগল। চণ্ডীমাসী যেতে যেতে বললে—আঃ মল যা। বলে ঝামটা মেরে চলে গেল।

এদিকে রাগে দুঃখে অপমানে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন প্রভাময়ী। পণ্ডিত মশাইকে বললেন—তুমি অন্য বাসা দেখ, এখানে বসে আমি আমার অনুর বিয়ে দেব না—কিছুতেই দেব না।

চণ্ডীমাসীর তাড়া খেয়ে সেদিন ট্যাক্সিতে আসতে আসতে সরিতের মনে হতে লাগল তার দেহের সমস্ত উত্তাপ যেন কানের দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তার হাতপা-গুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। তার যেন আর নড়বার চড়বার, কথা বলবার শক্তি নেই।

তার এই অসহায় অবস্থাটা ড্রাইভার হরদয়াল সিংও বুঝেছিল। আরে তারও তো একদিন যৌবন ছিল। আজ না হয় তার দাড়িতে পাক ধরেছে। একদিন এই দাড়িই সে কত কায়দা করে আঁচড়িয়েছে! গোঁফের দুই প্রান্তকে কত যত্নেই না সুঁচালো করেছে! মাথার পাগড়ীটা কত সুন্দর করেই না বেঁধেছে! কেন— ?

'পঞ্চনদের তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে—' আর একটি বিনুনীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার জন্যে। সে কি আজকের কথা!

তাই সরিৎ যখন বললে—আমাকে নিমতলায় নিয়ে যেতে পার সর্দারজী ? তখন সে ফিক্ করে হেসে যা উপদেশ দিল—তার সারমর্ম হ'ল এই—যে, বাবুজী এতেই তুমি পিছু হঠে যেও না। আবার চেষ্টা করে দেখ। আর এটা সব সময় ইয়াদ্ রাখবে—প্রিয়ার জন্যে বুকে যেমন মহব্বত্ রাখবে তেমনি রাখবে বুকের মধ্যে সাহস, আর দেহে রাখবে তাগদ্, হাতে রাখবে হাতিয়ার। এ সব ব্যাপারে দু' চারটা দুশমন দেখা দেবেই। তার জীবনেও এই রকম হয়েছিল। কিন্তু তার বুকে প্রেমও ছিল, সাহসও ছিল, আর হাতেও ছিল হাতিয়ার। তাইতো দুশমন সুজন সিংকে কৃপাণ দিয়ে এক কোপে দু টুকরা করে পথের কাঁটা সাফ্ করে দিয়েছিল। তাতে অবশ্য তার একটানা দশ বছর জেল খাটতে হয়েছিল। ফাঁসীও হতে পারত তার। কিন্তু তাতে কোনো দুঃখ ছিল না হরদয়াল সিংয়ের। আরে মরদ্‌কা লিয়েই তো কয়েদখানা আওর ফাঁসীর দড়ি! পথের কাঁটা তো সাফ্ হল! কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখে যে তারই দোস্ত্ প্রিতম সিং তার প্রিয়াকে নিয়ে ভেগে গেছে! দুঃখ যা পাবার সে এখানেই পেয়েছে। এই পর্যন্ত বলে হরদয়াল সিং একটু থামল।

তারপর বললে—দেখিয়ে বাবুজী, রুপয়া আউর রূপসী দুইই সমান। যো পাবে সেইই লিয়ে লিবে।

কথাগুলো সরিতের কানে একবর্ণও গেল কিনা বোঝা গেল না। সে শুধু এক সময় বলে উঠল—ঠনঠনে।

তারপর ঠনঠনের কাছে নেমে পড়ে বাকী পথটা হেঁটেই বাড়ী ফিরল সরিৎ। তার একমাত্র সান্ত্বনা, কেউ তাকে চিনতে পারে নি এই যা রক্ষা!

হাঁটতে হাঁটতে নিজকে একটু সতেজ করে নিতে গিয়ে সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত দিল সরিৎ। কিন্তু হাতখানা তার পকেট খুঁজে পাচ্ছে না দেখে, চেয়ে দেখল যে পকেট তো দূরের কথা পকেটের চারপাশের কাপড়ের পর্যন্ত চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু জায়গাটা একটা গহ্বরের সৃষ্টি করেছে মাত্র। আর ফিকে সবুজের উপর সাদা স্ট্রাইপ-ওয়ালা জামাটা থাকায়, সেই গহ্বরের উপর বটগাছের সরু সরু ঝুরি নামার মত, সাদা ও সবুজ ফালিগুলো ঝুলে আছে।

হঠাৎ সরিতের যত রাগ গিয়ে পড়ল অনিমেষের উপর। ওর বুদ্ধিতেই তো গিয়ে এই কেলেঙ্কারিটা হ'ল!

সরিৎ যখন গিয়ে তার ঘরের মধ্যে দাঁড়াল, তখন তাকে দেখলে যে কারুরই মায়া হ'ত। জামাটা পকেটহীন, মাথার চুল এলোমেলো। চোখ বসে গেছে। যেন একটি ঝড়ো কাক। ভাগ্য ভাল, দাদা তখন বাড়ী নেই আর বৌদি তখন রান্নাঘরে! সে তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে দলা পাকিয়ে আল্না লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরে ধপ্ করে চেয়ারটার উপর বসে পড়ল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মমতা সরিতের ঘরটা গোছাবার জন্যে ঘরে ঢুকল। আল্না গোছাতে গিয়ে লক্ষ্য পড়ল দলা পাকানো নূতন পাট ভাঙা জামাটার উপর। শীতকালে খুন্‌খুনে বুড়োমানুষ যেমন হাত পা গুঁজে দলা পাকিয়ে বসে থাকে, তেমনি ভাবে জামাটা

আল্‌নার নীচে পড়ে ছিল। মমতা সেটাকে হাতে তুলেই 'থ' বনে গেল। এই সেদিন জামাটা করা হয়েছে, আর এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেললে কী করে? এবাড়ীর সব কিছুই তাকে নখদর্পণে রাখতে হয়। জামাটা যে তৈরী হয়ে এই প্রথম ধোপার বাড়ী থেকে এসেছে, সে তার অজানা নয়। সে যখন অবাক হ'য়ে জামাটা দেখছিল, ঠিক তখন অফিস ফেরত সরিৎ এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বৌদির হাতে জামাটা দেখে, একপা দু'পা করে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু বৌদির চোখে চোখে পড়ে যাওয়াতে একগাল হেসে বললে—এই যে বৌদি, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম—।

মমতা বললে—এই তো অফিস থেকে এলে। কখন তুমি খুঁজলে বল দেখি—?

সরিৎ বললে—মানে পথে আসতে আসতে—

মমতা বললে—ওঃ পথে পথে খুঁজছিলে—! ভাল যাহক'—!

থতমত খেয়ে বললে সরিৎ—না মানে,—তারপর কথাটাকে ঘোরাবার জন্য বললে—আচ্ছা টুটুলটা গেল কোথায় বলো দেখি—? বলেই হাঁক দিল—টুটুল—টুটুল! কোথায় গেলি মুখপুড়ী—?

বৌদির একখানা এগারো হাত শাড়ী পরে হাতে একটা ছোট্ট খুন্তী নিয়ে টুটুল বিরক্তির সঙ্গে এসে বললে—এখন আমাকে খবরদার বলছি ডাকবে না। এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত।

সরিৎ বললে—কী কাজে ব্যস্ত শুনি?

টুটুল চোখ মুখ ঘুরিয়ে বললে—ও বাবাঃ, রান্না বান্না, একাজ সেকাজ, রাজ্যের ঝঞ্ঝাট পড়ে রয়েছে। ছেলে মেয়েগুলো ক্ষিধে ক্ষিধে করে মাথা খেয়ে ফেলছে! আমার বলে কিনা—হুঁ! —বলে পাকা গিন্নীর মতই দ্যুম্‌ দ্যুম্‌ করে পা ফেলে চলে গেল।

হেসে উঠল সরিৎ, বললে—শুনলে বৌদি, বুড়ি ঠানদির কথাটা একবার শুনলে?

হাসল মমতাও। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হ'য়ে বললে—তা তো যেন হ'ল কিন্তু এই নূতন জামাটা ছিঁড়ে আনলে কোত্থেকে বলত?

নাঃ, সরিতের চেষ্টা সফল হ'ল না। এত করেও বৌদির মনটা অন্যদিকে ঘোরাতে পারা গেল না। জামাটাকে যদি সে গুম্ করে ফেলত, তাহলে আর এই বিপদে তাকে পড়তে হত না। কিন্তু কী জবাব সে দেবে, হঠাৎ খুঁজে পেল না। তাই ঢোক গিলে বললে—কোত্থেকে আবার—! ছিঁড়ে গেছে—তাই ছেঁড়া দেখাচ্ছে—!

মমতা বললে—কিন্তু এ যেন মনে হচ্ছে, কোথাও বিঁধে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে—?

সরিৎ ঠোঁট উল্‌টে বললে—হবে হয় তো।

মমতা বললে—এই সেদিন, খেলার মাঠ থেকে নতুন জুতোর একপাটি শুধু হাতে করে বাড়ী ফিরে এলে। বললে—পুলিশের ঘোড়ার তাড়া খেয়ে, তোমাদেরও নাকি ঘোড়ার মত ছুটতে হয়েছিল।

সরিৎ এবার কথা বলার সূত্র পেয়ে বলে উঠল—ওরে বাপ! সেখানে গাধার মত চললে কি আর রক্ষে আছে! গুঁতো খেয়ে অক্কা পেতে হবে না—?

মমতা বললে—তাই গুঁতো এড়াতে গিয়ে, সেদিন বুঝি জুতো রেখেই আসতে হ'ল। সেকথা যাক, এ আবার কোথায় ছুটতে গিয়েছিলে শুনি—যে আধখানা জামাই রেখে আসতে হ'ল!

ততক্ষণে মনে মনে তৈরী হয়ে গেছে সরিৎ। বললে—ঐ—ঐ খেলার মাঠেই! বুঝলে বৌদি, কাল খুউব মারামারি লেগে গেছিল। ইয়া—ইয়া থান ইট ঝপাঝপ্ পড়তে লাগল, ছাতার বাঁটগুলো পটাপট ভাঙতে লালল। মারলাম চোঁ-চা দৌড়, দৌড়তে গিয়ে জামার পকেটটা বেধে গেল একজনের ছাতার বাঁটের সঙ্গে। তখন আর জামা! বলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি—হুঁঃ! বলে সরিৎ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিন্তু হতাশ হতে হ'ল। মমতা বলে উঠল—কালকে আবার কী খেলা ছিল মাঠে?

সরিৎ বলে উঠল—কেন—ঐ ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কাল তো খুব জোর খেলা ছিল মাঠে!

মমতা বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—সে কী! এই না সেদিন তোমার দাদার সঙ্গে আলোচনা করলে যে, এবারের মত খেলা শেষ হয়ে গেল! এ-ত বড় শক্ত হাকিমের পাল্লায় পড়া গেল! সরিৎ থতমত খেয়ে বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—একটা খেলা তো ছিল নিশ্চয়ই—। না হলে গড়ের মাঠটা কাল ফাঁকা গেছল নাকি বলতে চাও?

মমতা একটু চেয়ে থেকে হেসে বললে—গড়ের মাঠ ফাঁকা না থাক—, তোমার পিঠখানা যে ফাঁকা হয়ে যায়নি এই রক্ষে!

সরিৎ আতঙ্কমিশ্রিত কণ্ঠে বললে—তা যা বলেছ বৌদি, পিঠখানা নিয়ে যে আসতে পেরেছি এই রক্ষে। সরিতের চোখের সামনে চণ্ডীমাসীর সসম্মার্জনী মূর্তিটা ভেসে উঠল।

মমতা জামাটা আলনায় রাখতে রাখতে বললে—আসল কথা, কোথায় বিঁধে যে ছিঁড়েছে তুমি তা ঠিক মনে করতে পারছ না।

সরিৎ বললে—ঠিক বলেছ—। কাল ট্রাম থেকে নামবার সময় যেন একবার জামাটা কিসে যেন আটকে গিয়েছিল মনে হচ্ছে।

মমতা বললে—আর তখন তোমার মনটা চলে গেছিল—বাগবাজারের কাঁটাপুকুর লেনে। তা হ্যাঁ—ঠাকুর পো—, তোমার তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে হয় না—?

সরিৎ হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যস্তভাবে ডাক দিল —টুটুল—টুটুল—

বাড়ীর ভেতর থেকে ঝাঁঝাল কণ্ঠে জবাব দিল টুটুল—এখন কিচ্ছু শুনতে পারব না—এখন আমি রান্না করছি—

—দাঁড়া তোর রান্না বার করছি—। বলে সরিৎ দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মমতা হেসে বললে—আবার কোথাও বেরিও না যেন। জল খাবার খেয়ে যেও। বলে হেসে কাজে মন দিল।

—তুমিই বুঝি এ বাড়ীর বড় বউ—?

মমতা মুখ ফিরিয়েই অবাক হয়ে গেল। পিছন থেকে ঝি সুরুচির মা বললে—আপনাকে খুঁজছেন—

মমতার বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে চণ্ডীমাসী বললে—বাঃ বাঃ, যেন লক্ষ্মী পিতিমে !

মমতা বললে—তা আপনি—

চণ্ডীমাসী বললে—আমি তোমাদের এই পাশের বাড়ীর পটলার মাসী !

পটলা সম্বন্ধে মমতার জ্ঞান যদিও খুবই সীমাবদ্ধ, তবু মমতা মুখে খুশির ভাব এনে ভদ্রতার খাতিরে বললে—ওঃ তাই নাকি— ! বসুন—বসুন— । বলে একটা মাদুর বিছিয়ে দিল মেঝেতে।

চণ্ডীমাসী না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগল—আমি ভাই থাকি বাগবাজারে। তা বোনের বাড়ী আমাকে প্রায়ই আসতে হয়। অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে তোমাদের সঙ্গে একটু আলাপ করব। বোনের কাছে শুনেছি তোমরা নাকি খুব ভাল লোক গো— ।

মমতা হেসে বললে—ভাল না আরও কিছু ! ওকি, বসুন !

চণ্ডীমাসী বসতে বসতে বললে—আজ কিন্তু ভাই আমি বেশী সময় বসতে পারব না। আমি একটু অশান্তির মধ্যেই আছি কিনা !

সহানুভূতি জানিয়ে মমতা বললে—কেন বাড়ীতে কারো অসুখ বিসুখ—

চণ্ডীমাসী বললে—তা চিত্তে সুখ না থাকলেই অসুখ বলতে পার বৈকি ! অশান্তিটা আমার গোপালকে নিয়ে।

মমতা বললে—গোপাল— ! মানে আপনার ছেলে বুঝি— ?

চণ্ডীমাসী বললে—পেটের ছেলে নয়, বোনের ছেলে। আমরা তিন বোন ছিলাম। আমি বড়, মেজ মাতঙ্গিনী, আর ছোট, তোমাদের পাশের বাড়ীর এই জয়দুর্গা। তারপর আক্ষেপের সঙ্গে বললে—আমার কপালে ভগবান সন্তান লেখেননি। মেজবোন এই গোপালকে তিনমাসের রেখে মারা গেল। সেই থেকে গোপাল আমার কাছেই আছে।

মমতা বললে—তা সে তো এখন আপনার ছেলের মতই হয়ে গেছে।

সন্তানহীনার সন্তান কামনা, অলক্ষ্যে মমতার মনেও উঁকি দিল বোধ হয়। তাই সে সমব্যথীর মত বললে—পেটে না হলেও, সন্তানের দুঃখ আপনার ঘুচে গেছে।

চণ্ডীমাসী বললে—তা যা বলেছ! তা দেখো এতটুকু থেকে এত বড়টি করেছি, এখন কোথায় দেখে শুনে মনের মত বউ আনব ঘরে তা নয়, ও ব্যাটাচ্ছেলে কিনা একটা মেয়েকে দেখে ভুলে বসে আছে!

মমতা বললে—তা সেই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো পারেন।

চোখ মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত করে বললে চণ্ডীমাসী—কী বললে—সেই কুলখাকীকে ঘরে আনব আমি! তুমি বল কি? আমাদের কি কোনো মান মযযাদা নেই নাকি ভেবেছ! আরে এই করে করে ওই ছুঁড়িটা পাড়ার কত ছোঁড়ার যে মাথা খেয়েছে তার কি কোনো হদিস আছে? তা ছাড়া এখন পাড়া ছেড়ে বেপাডা থেকে তার নাগর আসে গো—! বলে মমতাকে একটা ঠেলা দিয়ে হেসে উঠল।

মমতাও ঘৃণার সঙ্গে বললে—এ-মা! তাই নাকি? ছিঃ ছিঃ!

চণ্ডীমাসী উৎসাহের সঙ্গে বললে—না হলে আর বলছি কি? সেদিন বিকেলে তো একটা ছোঁড়া এক টেক্‌সি নিয়ে গিয়ে হাজির। গিয়ে বাড়ীর চারদিকে ঘুর ঘুর লাগিয়েছে। বোঝ ব্যাপারখানা!

মমতা বললে—তারপর—?

চণ্ডীমাসী বললে—তারপর আর কি? আমার চোখে পড়ে গেল। দিলুম ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে। কী কেলেঙ্কারির কথা বল! আর আমার ছোঁড়াটা কিনা, তাকে দেখেই ভুলেছে! তা ছেলেরই বা দোষ কী বল? বয়সের একটা ধম্মো আছে তো! অমন গায়ে পড়ে যদি ঢলাঢলি করতে থাকে তো, ব্যাস বশিষ্ঠের পয্যন্ত মন টলে যায়, আর এতো সামান্য মনিষ্যি।

মমতা বললে—তা মেয়েটাকে শাসন করবার কেউ নেই নাকি?

চণ্ডীমাসী বললে—শাসন আর কে করবে বল? বাপ করে পণ্ডিতি, মাটা দজ্জাল। আর এদিকে মেয়েটা করে ধিঙ্গীপানা। তা দেখ, ছেলেটা গোঁ ধরে বসেছে, ঐ মেয়েকে বে করতে না

পারলে—গলায় দড়ি দেবে। তা আজকালকার ছেলেছোকরাদের আমি কানাকড়ি দিয়েও বিশ্বেস করি না। ওরা তা পারে।

চণ্ডীমাসী যে বিষ ছড়াচ্ছিল তাতে আস্তে আস্তে ফল ফলতে আরম্ভ করল। মমতার প্রাণেও সংশয়ের দোলা লাগল। সে বললে—মেয়েটির বাবা পণ্ডিত ? আরও একটু বোঝবার জন্যে বললে—তা মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিলেই তো পারে ?

চণ্ডীমাসী বললে—এতদিন তো গা করছিল না। এখন আমাদের পাঁচ জনের চাপে পড়ে তোমাদের এই বেচু চাটার্জী স্ট্রীটেই কোন বাড়ীতে যেন সোমন্দ করেছে। তা যাক বাপু, পাপ যত শীগ্‌গির বিদেয় হয়, ততই ভাল। আমার হয়েছে জ্বালা ভাই। ওরা আবার আমারই ভাড়াটে কিনা !

সংশয়ের মাত্রা শুধু বেড়েই চলল মমতার। কিন্তু চণ্ডীমাসীর সুনিপুণ প্রয়োগে, তার দেহে যে আস্তে আস্তে সংশয়-বিষের অনুপ্রবেশ ঘটছে, তা মমতা বুঝতে পারল না। সে বললে—আপনার ভাড়াটে ! আচ্ছা আপনার বাড়ীটা কোথায় বলুন তো ?

চণ্ডীমাসী বললে—সতরর এক, কাঁটাপুকুর লেনে। তা ভাই আজ উঠি। আসব আবার। বলে উঠে দাঁড়াল।

মমতা বললে—আচ্ছা। হ্যাঁ শুনুন, মেয়েটির বাবার নাম কী বলুন তো ?

চণ্ডীমাসী বললে—সুধামাধব ভট্টাচার্য। কেন, চেন নাকি তাকে ?

মমতা তাড়াতাড়ি বললে—না, ও এমনিই বলছিলাম। আচ্ছা, আসবেন আবার। কেমন ?

চণ্ডীমাসী হেসে বললে—আচ্ছা—আচ্ছা আসব বৈকি ! এখানে তো আমাকে প্রায়ই আসতে হয়। আচ্ছা চলি।

এমন সময় 'বৌদি' বলে হাঁক দিয়ে সরিৎ ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। বুকটা তার ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সে কোনোমতে বললে—আচ্ছা আমি না হয় পরেই আসব।

সরিৎ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে চণ্ডীমাসী দেখতে না পারলেও সরিৎ তাকে দেখেছিল। সে আর না করে, দ্রুতপদে বাড়ী থেকে সদর, সদর থেকে কালবিলম্ব একদম রাস্তায় পড়ে, যেদিকে দু'চোখ যায়, হন্ হন্ করে চলে গেল।

এ ঘরে কেউ আসছে টের পেয়েই চণ্ডীমাসী একগলা ঘোমটা টেনে দেয়াল চেপে দাঁড়িয়েছিল। একটু বাদে ঘোমটা খুলে বললে—আচ্ছা; আসি ভাই। বলে চলে গেল।

সুকৌশলে সবটুকু বিষ ঢেলে দিয়ে কালসাপিনী বিদায় নিল। পথে বেরিয়ে চণ্ডীমাসী ঐ পায়ে একদম ঠন্‌ঠনে এসে মাকালী আর শিবের কাছে পুজো দিল। আর বিয়েটা যদি ভেঙে যায়, তাহলে এর চেয়ে বড় করে পুজো দেবার লোভ দেখিয়ে নিশ্চিন্তে, নিরুদ্বেগে শ্যামবাজারগামী ট্রামে উঠে বসল।

মমতার মনে বিষক্রিয়া শুরু হ'ল। গুম হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শেখরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। শেখরও মমতার খোঁজেই এদিকে আসছিল। দেখা হতেই শেখর বললে—এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। আরে কাল এক কাণ্ড হয়েছে, সেকথা তো তোমাকে বলাই হয়নি। কাল যাচ্ছিলাম শ্যামবাজারে। হঠাৎ দেখি কি, পণ্ডিত মশাই এক বাসনের দোকানে ..স এক ঝাঁকা বাসন কিনছেন। দেখেই—

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মমতা গম্ভীর ভাবে বলে উঠল—আচ্ছা, পণ্ডিত মশাইরা তো বাগবাজারে সতরর এক কাঁটাপুকুর লেনে থাকেন?

মমতার চোখ মুখের ভাব আর জিজ্ঞাসার ধরন দেখে শেখরের যেন কেমন একটু খটকা লাগল। সে বললে—হ্যাঁ।

মমতা তেমনি ভাবে বললে—আচ্ছা, মেয়েটি সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিলে হয় না?

শেখর অবাক হয়ে বললে—তার মানে?

মমতা বললে—তার মানে, যে মেয়েটিকে ঘরে আনবে, তার স্বভাব চরিত্র কেমন, একটু জেনে নেবে না ?

মনে হ'ল শেখর যেন আচমকা একটা জোরে ধাক্কা খেল। সে প্রথমে কিছু বলতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে বললে—পণ্ডিত মশাইর মেয়ে এইটাই তো তার বড় সার্টিফিকেট মমতা !

মমতা বললে—পণ্ডিত মশাই ভাল লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মেয়েটি যে তাঁর মত ভাল হবেই, এমন তো নাও হতে পারে।

শেখর বললে—কিন্তু হঠাৎ তোমার এ সন্দেহ কেন ?

মমতা বললে—কারণ আছে বলেই বলছি।

শেখর বললে—কী ব্যাপার খুলেই বল না।

মমতা বললে—ও ঘরে চলো। এখানে ঠাকুরপো এসে পড়তে পারে। বলে মমতা তাদের শোবার ঘরে গেল। হতচেতনের মত শেখর তাকে অনুসরণ করল।

আনন্দের জোয়ারটা পূর্ণ উদ্যমে বইতে না বইতেই, ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেল।

—না—না—এ আমার বিশ্বাস হয় না।

চণ্ডীমাসীর আগমন থেকে আরম্ভ করে, চলে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কথা বর্ণনা করে মমতা যখন বললে—যা শুনলাম, তাতে আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটির স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তখন তার প্রতিবাদে শেখর উপরোক্ত মন্তব্য করে বললে—এটা তার একটা অভিসন্ধিও তো হতে পারে ?

মমতা বললে—কী অভিসন্ধি থাকতে পারে বলো ? যদি বুঝতাম কুৎসা রটিয়ে বিয়েটা ভাঙতেই সে এসেছিল, তাহলে সে ঐ ভাবে কথা বলত না। তার কথা থেকে বুঝলাম সে জানেই না যে আমরাই সেই লোক।

শেখর বললে—তবু আমার বিশ্বাস হয় না।

মমতা বললে—বিশ্বাস তোমার হোক বা না হোক, তোমার একবার ভাল করে খোঁজ নিয়ে আসতেই হবে। এটা জেনো, যা রটে, তার কিছু বটে।

শেখর বললে—তা যাই রটুক আর যাই ঘটুক, এ বিয়ে হতেই হবে।

মমতা বললে—হ'তেই হবে?

শেখর দৃঢ়ভাবে বললে—হ্যাঁ, কারণ আমি তাঁদের কথা দিয়েছি।

মমতা বললে—তোমার কথার মূল্য দিতে গিয়ে, সংসারে চিরদিনের জন্যে একটা অশান্তি ডেকে আনবে?

শেখর বললে—কিন্তু আমার মন বলছে, এতে অশান্তির কিছু হতে পারে না। তারপর ভারী গলায় বললে—জানো মমতা, আমি যখন পণ্ডিত মশাই আর তাঁর স্ত্রীর প্রস্তাবে এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম, তখন তাঁদের বুক থেকে যে কী গুরু পাষাণ ভার নেমে গেল, তা তাঁদের চোখ মুখের সেই প্রশান্ত ভাব না দেখলে তুমি বুঝতেই পারবে না।

মমতা বললে—কিন্তু তাঁরা তো আর আমাদের সংসারে আসছেন না। আসছে তাঁদের মেয়েটি। তুমি আনতে চাও আনো, বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। তবে আমার আপত্তি আছে, এই কথাটাই শুধু জানিয়ে রাখলাম।

সন্দেহটা সংক্রামক ব্যাধির মত। যত সুস্থ স্বাস্থ্যবান লোকই হোক না কেন সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে বার বার এলে আস্তে আস্তে সেই ব্যাধি তার দেহে সংক্রামিত হবেই। শেখরেরও তাই হ'ল। মমতার সন্দেহটা তার মনেও ছোঁয়াচ লাগাল। কিন্তু অপর দিকে মন তার কিছুতেই মানতে চায় না। তাই সে মমতার সন্দেহটা নিরসন করবার শেষ চেষ্টা করে বললে—কিন্তু তোমার সন্দেহটা মিথ্যেও তো হতে পারে।

মমতা বললে—মিথ্যে হোক, এটাই আমি মনে প্রাণে চাই। কিন্তু সত্যি বা মিথ্যে, দুটোই এখন প্রমাণ সাপেক্ষ।

শেখর বললে—নাঃ ব্যাপারটা তো বেশ জটিল করেই তুললে দেখছি। তাহলে তুমি একবার যেতেই বলছ সেখানে?

মমতা বললে—হ্যাঁ। গিয়ে মেয়েটিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য করে দেখো। আর আশে পাশে একটু খোঁজ খবর নিও।

অগত্যা শেখর বললে—বেশ যাব। কিন্তু আমি আবার বলছি মমতা, এ আমার মন কিছুতেই মানতে চাইছে না। এ যেন আমি ভাবতেই পারি না যে পণ্ডিত মশাই অমন নিষ্ঠাবান লোক, তাঁর ঘরে—কী জানি—! বলে চিন্তিত ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় সরিৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—নিমন্ত্রণ চিঠিগুলো তাহলে আমার সেই বন্ধুর প্রেসেই ছাপতে দিয়ে দিই দাদা?

—এখন থাক, পরে দিলেও চলবে। বলে গম্ভীর ভাবে শেখর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সরিৎ হতবাক্ হয়ে দাদার গমনপথের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বৌদির দিকে চেয়ে দেখল—সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। সরিৎ বৌদির কাছে এসে বললে—কী ব্যাপার বৌদি, হঠাৎ তোমরা এত থম্‌থমে হ'য়ে গেলে কেন?

মমতা বললে—কই, না তো—?

সরিৎ বললে—কই না তো! আয়নাটা এনে ধরব মুখের সামনে—? কী হয়েছে বল না?

বস্তুতঃ চণ্ডীমাসীকে এখানে দেখেই আক্কেলগুড়ুম্ হ'য়ে গিয়েছিল সরিতের। তখন থেকেই সে এই মহিলাটির আগমন বৃত্তান্ত শুনবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছিল। বাইরে বাইরে কিছুক্ষণ অযথা ঘোরাঘুরি করে, অবশেষে বৌদির খোঁজে এসে দাদা বৌদিকে অমন গম্ভীর দেখে, সে বুঝেছিল—নিশ্চয়ই সেই ঝটিকা-ধারিণী তার সেদিনের কথা কিছু বলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু কী বলে গেছে, সেটা না জানা পর্যন্ত মনের স্বস্তি নেই। দাদার কাছে চিঠি ছাপতে দেবার কথা জিজ্ঞেস করাটা অছিলা মাত্র।

মমতা চুপ করে আছে দেখে সরিৎ আবার তাগিদ দিল—ও বৌদি বল না গো— !

মমতা বললে—সে তোমার শুনে কাজ নেই।

সরিৎ বললে—কিন্তু তোমাদের ভাব দেখে মনে হয়, আমার শোনাটাই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। দাদা হঠাৎ চিঠি ছাপাতে দিতে বারণ করলেন কেন? অথচ কালকেও এ নিয়ে তোমরা আমাকে কত তাগিদই না দিয়েছ—! কী হয়েছে বলো না ?

সরিতের আকুলতায় কতকটা বাধ্য হয়েই মমতা বললে—ও সম্বন্ধ বোধ হয় হবে না।

সরিৎ বললে—হবে না—মানে—কোনো কারণ— ?

মমতা বললে—কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে।

সরিৎ মুখে খুশির ভাব দেখিয়ে বললে—এ অবশ্য ভালই হ'ল। আমার তো গোড়া থেকেই ভীষণ আপত্তি ছিল। কী দরকার এসব ঝঞ্ঝাটের ? তা কারণটা কী—মানে খুব গোপনীয় নাকি— ?

মমতা বললে—হ্যাঁ গোপনীয়।

সরিৎ বললে—গোপনীয় হ'লে অবশ্য শুনতে চাই না। তবু যদি একান্তই বাধা না থাকে তো বলই না। একটা কৌতূহল হওয়া তো স্বাভাবিক।

মমতা বললে—ও মেয়ের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ পোষণ করি।

সরিৎ চোখ কপালে তুলে বললে—ওঃ, স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে? তাহলে তো হ'তেই পারে না। কিন্তু কী ধরনের কথা শুনেছ— ?

মমতা বিরক্ত হ'য়ে বললে—সেটাও তোমার শোনা দরকার— ?

সরিৎ বললে—না, তেমন কিছু নেই। তবে সবটাই যখন বলেছ, তখন—তা ছাড়া মিথ্যেও তো হতে পারে।

মমতা বললে—সত্যি কি মিথ্যে, তা তুমি কী করে জানলে ?

এইরে ! আর একটু হলেই ধরা পড়েছিল আর কি ! থতমত খেয়ে বললে সরিৎ—না-না, আমি জানব কী করে— ? ও এমনিই

বলছিলাম। মানে আমি বলছিলাম—গুজবও তো হতে পারে। এই আর কি। বলে হেঃ·হেঃ করে হেসে, একটু রসিকতাও করতে চেষ্টা করল।

মমতা বললে—গুজব হতে পারে, কিন্তু আমার ধারণা এটা সত্যি। কারণ, সেই বাড়ীর লোকই এসে বলে গেল—।

রুদ্ধশ্বাসে বললে সরিৎ—কী বলে গেল ?

মমতা বললে—বললে সেই মেয়েটির কীর্তির কথা! কাল নাকি ট্যাক্সি নিয়ে পর্যন্ত একটা ছোঁড়া গিয়েছিল সেই মেয়ের কাছে—।

লাটিমের মত ঘুরে গেল সরিতের মাথাটা। বলে উঠল—ট্যাক্সি নিয়ে—! তারপরই সামলে নিয়ে বললে—ওঃ ট্যাক্সি নিয়ে—?

—হ্যাঁ! বলে গম্ভীর ভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেল মমতা।

সরিৎ দুহাত দিয়ে নিজের মাথাটা টিপে ধরে দ্রুত কয়েকবার পায়চারী করল ঘরের ভেতর। তার কেবলই মনে হতে লাগল,—এই মুহূর্তে যদি অনিমেষকে একবার হাতের কাছে পাওয়া যেতো, তাহলে ওর ঐ লিক্‌লিকে গর্দানটার উপর বিরাশি সিক্কা ওজনের একটা রদ্দা বসিয়ে দিত।

এমন সময় টুটুল ঘরে ঢুকেই ডাক দিল—ছোড়দা—ছোড়দা—ও ছোড়দা—

সরিৎ তড়িৎ-গতিতে ওর দিকে ফিরে বললে—বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা ঘর থেকে!

টুটুল বললে—বারে' বেরিয়ে যাব কেন? আমি তো বৌদির কাছে ঘুমোতে এসেছি!

সরিৎ বললে—বেশ, তবে আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি। বলে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট ধরে, পুব দিকে হাঁটতে লাগল সরিৎ। ক্রমে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়ে উত্তর দিকে এগোতে

লাগল। আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা ডাইনে রেখে এগোতেই হৃষীকেশ পার্ক। সরিৎ পার্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

রাত দশটা, এগারটা—এগারটাও ছাড়িয়ে চলল। মমতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। সুরুচির মা এসে বললে—ছোটবাবু এখনো তো এলেন না মা?

মমতা বললে—তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। আমি রইলাম।

শেখর এসব কিছু টের পায়নি। সে যথারীতি খেয়ে শুয়ে পড়েছে। মমতা বসে রইল ভাত আগলে।

সরিৎ ভেবে চলেছে আকাশ পাতাল। বিয়ে হোক এটা বড় কথা নয়, কিন্তু মাঝখানে যে কেলেঙ্কারিটা হয়ে গেল, সেটা যদি ঘুণাক্ষরেও কোনোদিন প্রকাশ পায়, তবে লজ্জার আর অবধি থাকবে না। সব চেয়ে অনুতাপের বিষয়—তারই হঠকারিতার ফলে, একজন দরিদ্র পিতা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে পারলেন না।

থানায় সময় জ্ঞাপক ঘণ্টা বাজে, আর সেটা বেশ কিছুদূর থেকেই শোনা যায়। কিন্তু সরিৎ যেন শুনল হঠাৎ এখন। শুনবার একটু কারণও ছিল। ঠাসা এক প্যাকেট সিগারেট ছিল পকেটে। সিগারেট খুঁজতে গিয়ে পকেটটা হাতড়ে একটাও না পেয়ে অবাক হ'য়ে তাকাল প্যাকেটটার দিকে। দেখল একদম খালি। তখনই তার ধ্যানভঙ্গ হ'ল। আর তখনই সে বুঝতে পারল, হৃষীকেশ পার্কে বসে থাকলেও আসলে সে এতক্ষণ ছিল কাঁটাপুকুর লেনে।

থানায় এক নাগাড়ে বেজে চলছে ঢং ঢং করে সময় জ্ঞাপক শব্দ। ক্রমে বারোটা শব্দ হয়ে থামল।

ওরে বাপ! বারোটা বেজে গেছে! চারিদিকে চেয়ে দেখল পার্ক জনশূন্য। শীতের রাত বারোটা।

কুয়াশার সূক্ষ্ম ওড়নায় ঢাকা পার্কের আলোকস্তম্ভের বৈদ্যুতিক বাল্‌বগুলো যেন সরিতের দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। হাসবারই কথা। এক পাগল ছাড়া রাত বারোটার সময় ঘুটঘুটে শীতের মধ্যে কেউ হাওয়া খায় বসে! সরিৎ উঠে পড়ল। তার মনে পড়ে গেল রামচরণ বেরার কথা! তারও সেই অবস্থা হ'ল নাকি! সেও কি তার মত সারাটা জীবন—কাঁটাপুকুর লেন খুঁজে বেড়াবে না কি! দুত্তোর! বলে সরিৎ পার্ক থেকে দ্রুত বেরোতে গিয়ে পড়ল আর এক বিপত্তিতে। গেট দিয়ে ঢুকছিল ঘটোৎকচ তলাপাত্র। সরিৎকে দেখেই সে বজ্রমুষ্টিতে সরিতের হাত ধরে বললে—এই যে দাদা!

ঘটোৎকচের গায়ে একটি ধব্‌ধবে সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জী, পরনে একটি সাদা হাফ্‌প্যান্ট্‌। পায়ে সাদা স্কেট্‌ স্যু। পোশাকটা শীতের পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়। সরিৎকে অগত্যা ভদ্রতার খাতিরে বলতে হ'ল—তা কী খবর—ভাল তো?

এই কথায় ঘটোৎকচ বিকট শব্দে হেসে উঠল। বললে—আপনি হাসালেন যা হোক।

এর মধ্যে হাসির খোরাক যে কী আছে সরিৎ ভেবে পেল না। সে যাই হোক—এখন এই পালোয়ানের হাত থেকে কী করে মুক্ত হওয়া যায়, সেই চিন্তাই করতে লাগল সরিৎ। কারণ তার কব্জিটি তখনো ঘটোৎকচের বজ্রমুষ্টিতে বন্দী।

ঘটোৎকচ বললে—ভাল থাকব না মানে? আলবৎ থাকব। জানেন, আমার বাবা অত্যন্ত বিবেচক লোক ছিলেন। ওই যে বাড়ীটি দেখছেন, ওইটিই আমার। এই রকম আরো আটখানা বাড়ী তৈরী করে, তবে বাবা স্বর্গে গেছেন। মা গেছেন তারও আগে। আছেন এক বুড়ী দিদিমা। অপেক্ষা করে আছি, তিনি কবে পাড়ি জমাবেন। ব্যস্‌ তাহলেই আমি একেবারে মুক্তপুরুষ!

সরিৎ বললে—বাঃ বড়ই খুশী হ'লাম, আলাপ করে। আপনি সপরিবারে সুখে থাকুন, এই কামনাই করি। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

নমস্কার দিতে গিয়ে হাতটা ছাড়াতে গেল সরিৎ। কিন্তু ঘটোৎকচ সেটাকে আরও জোরে চেপে ধরে বললে—এবার আপনি আরও হাসালেন। আরে মশাই পরিবারটা আবার এল কোথেকে?

সরিৎ তাড়াতাড়ি বললে—ওঃ আপনি তো বোধহয় বিয়ে করেন নি—আচ্ছা—চলি। কিন্তু উহুঁ, ঘটোৎকচ হাত ছাড়ছে না। বললে—কী বললেন? বিয়ে! আমি! না মশাই, যেদিন থেকে শুনেছি স্ত্রীকে বলে অর্ধাঙ্গিনী, সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছি, আর যাই হোক বিয়ে অন্ততঃ করব না। আরে মশাই বহু তদবির তদারক করে যে দেহখানাকে তৈরী করেছি, তার অর্ধেকটাই নাকি দিয়ে দিতে হবে কোথাকার কোন্ স্ত্রীকে? হুঁ যত সব বোগাস্ আইডিয়া! বেশ আছি দাদা, খাই দাই—শরীর চর্চা আর সমাজ সেবা করি। চলুন, হাওয়া খেতে খেতে গল্প করা যাক। বলে সরিৎকে টেনে নিয়ে পার্কের মধ্যে ঢুকল।

প্রমাদ গণল সরিৎ। বললে—আপনার হাওয়া খাবার সময় বুঝি এখন? মানে রাত বোধ হয় বারোটা বেজে গেছে!

সরিৎ ভেবেছিল সময় সম্বন্ধে সচেতন করে দিলেই বুঝি ঘটোৎকচ তাকে মুক্তি দেবে!

কিন্তু সরিৎকে হতাশ করে দিয়ে ঘটোৎকচ বললে—মনে করলেই এটা রাত বারোটা, আর না করলেই সন্ধ্যা পাঁচটা। কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না—এই তো? তবে শুনুন—যারা দুর্বল, তাদের পক্ষে সন্ধ্যা পাঁচটাই রাত বারোটা। অর্থাৎ তাদের বারোটা বেজে গেছে বুঝতে হবে। আর সুস্থ সবল সমর্থ পুরুষ যারা, তাদের কাছে সময়ের কোনো প্রশ্ন নেই। সমস্যার কোনো বালাই নেই। দিন রাতের কোনো ভেদাভেদ নেই। এই তো আমি। এই সময় ব্যায়াম করে রোজ এখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যে হাওয়া খেতে আসি। এই সময়ই কিছুটা নির্মল অক্সিজেন পাওয়া যায়। এরপর গিয়ে চান করব, তারপর কিছু লাইট্ ফুড্ খেয়ে শুয়ে পড়ব।

সরিৎ বললে—ওঃ আপনি বুঝি লাইট্ ফুড্ খেয়ে থাকেন? আচ্ছা! তাহলে এখন আসি—

ঘটোৎকচ সরিতের হাতটা শক্ত করে ধরে বললে—হ্যাঁ রাতের বেলা আমি লাইট্ ফুডই খেয়ে থাকি। এই বেশী কিছু না, মাত্র এক কিলো মাংস, চারটা পাঁউরুটি, দশটা ডিম সিদ্ধ, একপো পিঁয়াজ, পাঁচটা টমেটো, দু ডজন কলা, তিনটে আপেল, এক ডজন কমলা লেবু, আধ কিলো মিশ্রি দিয়ে বাদামের শরবত। হ্যাঁ, চারশ গ্রাম করে ছানা আমি দু'বেলাই খেয়ে থাকি।

রাতের বেলার লাইট ফুডের ফিরিস্তি শুনে আর দিনের বেলার হেভী ফুডের কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয়নি সরিতের।

যাই হোক, ঘটোৎকচ তার বজ্রমুষ্টিটা একটু শিথিল করতেই, হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরিৎ বললে—আচ্ছা চলি, আবার দেখা হবে, কেমন ?

এতক্ষণে ঘটোৎকচের খেয়াল হ'ল। বললে—ওঃ আপনি তা'হলে হাওয়া খেতে আসেন নি ?

সরিৎ বললে—মোটেই না।

ঘটোৎকচ লজ্জিত হ'য়ে বললে—Sorry, আপনাকে মিছিমিছি আট্‌কে রেখে কষ্ট দিলাম। হ্যাঁ, শুনুন—আপনার সেই বন্ধুটি কেমন আছেন ? বড় উইক্ ভদ্রলোক। ওঁর তো বিয়ে করা উচিতই নয়। দেখুন, বিয়ে করা উচিত কিনা, এই নিয়ে আমাদের সমাজ সংস্কার সংঘে একটা বিতর্ক সভার আয়োজন করব ভেবেছি। আমার মনে হয় কারুরই বিয়ে করা উচিত নয়। বলবেন যে তাতে সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। তা যাক, যা সৃষ্টি হয়েছে এরই হিল্লে হোক আগে! তারপর একশ বছর বাদে আবার না হয় সৃষ্টির কথা চিন্তা করা যাবে। আমাদের সম্পাদিকার কাছে বিষয়টা পেশ করব ভেবেছি। আমাদের সম্পাদিকা মিস্ সিংহাকে দেখেছেন তো! কেমন জবরদস্ত চেহারা! ওঁর নিজের যা আছে, তাতে কি আর কারুর অর্ধাঙ্গিনী হবার প্রয়োজন আছে বলতে চান ? বরঞ্চ উনিই কিছুটা অঙ্গ ধার দিতে পারেন—বলে সরিৎকে একটা ঠেলা দিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল ঘটোৎকচ।

সরিৎ যত বেরোতে চাইছে ঘটোৎকচ ততই তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। সরিৎ একবার ভাবল একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলে, যে পাগলের প্রলাপ শুনবার আমার সময় নেই। কিন্তু ঘটোৎকচের চেহারার দিকে চেয়ে সাহস পেল না। তাই একটু হেসে বললে—তা যা বলেছেন, আচ্ছা। আবার দেখা হবে—এখন চলি।

ঘটোৎকচ তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে বললে—নিশ্চয়ই। তা আসুন না আমার বাড়ীতে একদিন। ব্যায়ামের কয়েকটা কসরৎ দেখাব। যেমন, এই দেখুন আমার হাতের বাইসেফ্‌টা। বলে হাতটা গুটিয়ে বাইসেফ্‌টা নাচাতে লাগল। বললে—টিপে দেখুন—কেমন ক্রিকেট খেলার ডিউজ্‌ বলের মত শক্ত। আচ্ছা এবার দেখুন দু'হাতের গুলিদুটো কেমন একটার পর একটা নাচাব। বলে প্রক্রিয়াটা দেখাল। আচ্ছা এখন দেখুন দুটোই একসঙ্গে নাচবে। আচ্ছা এবার দেখুন—বুকের ছাতিটা এক্‌স্‌প্যাণ্ড করলে কত বড় হয়। বলে কায়দাটা দেখিয়ে বললে—এবার বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় যোগ দেব ভেবেছি। সেখানের জন্যে কয়েকটা পোজ্‌ তৈরী করে রেখেছি। ওঃ আপনাকে আটকে রাখছি বুঝি? আচ্ছা বাড়ীতে এলেই দেখাবখন। এই রকম কতকটা আর কি। যেমন মহাপ্রভু চলেছেন নীলাচলের পথে। বলে গৌরাঙ্গ মূর্তি হ'য়ে ঘটোৎকচ দু হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াল।

সরিৎ এই ফাঁকে সরে পড়ছিল। ঘটোৎকচ তাকে চটকরে ধরে ফেলে বললে—আপনাকে আর আটকে রাখব না। তা বুঝলেন, এরকম পঞ্চাশটা পোজ্‌ তৈরী করেছি। প্রত্যেকটিই ভারতীয় কায়দা। বিদেশে ভারতের মানটাকে উঁচু করতে হবে তো! তার মধ্যে—দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দাঁত মুখ খিঁচে হালুম করে ঝম্প প্রদান। এতে দেহের সবকটি মাস্‌ল্‌ই বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমনকি গালের মাস্‌ল গুলোও। তারপর সেদিন দিদিমা রামায়ণে অষ্টাবক্র মুনির কথা পড়ছিলেন। সেটাও ভাল। দেহটাকে আটখানা

ভাঁজ করতে হবে। তারপর ধরুন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে চুরি করে দেখবার জন্যে, চুপি চুপি আয়ানের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুর ঘুর করছে, হঠাৎ জটিলা কুটিলা দেখতে পেয়ে—'কেরে মিনসে' বলে বেরিয়ে এল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে লুকোবার জন্যে দেয়াল লেপ্‌টে দাঁড়িয়েছিল—এটা অবশ্য আমার কল্পনা—।

সরিৎ তাড়াতাড়ি বলে উঠল—দেখুন আপনার কল্পনাগুলো প্রায় সব কটিই প্রাণবন্ত। তা এখন প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বাজে। এই অল্প আলোতে সেগুলো ঠিক জীবন্ত হয়ে উঠবে না, আমি বরঞ্চ আপনার বাড়ীতে যেদিন যাব, সেদিন সবগুলো পোজ্‌ দেখব। আজ চলি, কেমন—নমস্কার। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন্ হন্ করে সরিৎ বেরিয়ে গেল।

পিছন থেকে ঘটোৎকচ চেঁচিয়ে বললে—এই দাদা—আর একটা পোজ্‌ শুধু।

সরিৎ যেতে যেতে বললে—সেটা আর একদিন হবে। বলে দ্রুতপদে চলে গেল।

ঘটোৎকচ শরীরটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আপন মনে বললে—নাঃ হোপ্‌লেস্। বলে পাক দিতে লাগল পার্কে।

সরিৎ হেঁটে চলেছে বাড়ীর দিকে। যতই বাড়ীর কাছাকাছি হতে লাগল, ততই তার বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করতে লাগল। দাদা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু বৌদি? তাঁর কাছে সে কী কৈফিয়ত দেবে? না হয় বলবে যে নাইট শোতে সিনেমায় গিয়েছিল। কিন্তু না বলে এত রাতে কোথাও যাওয়া তো তাদের বাড়ীর রেওয়াজ নয়। যাক, না হয় বৌদির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। কী আর করা!

বাড়ীর বাইরের দিকের ঘরে সুরুচির মা থাকে। সরিৎ কড়া নাড়তেই সুরুচির মা উঠে জানালা দিয়ে জিজ্ঞেস করল—কে—?

সরিৎ চাপা গলায় বললে—আমি, দরজা খোলো।

দরজা খুলে দিতেই সরিৎ জিজ্ঞেস করল—বৌদি—?

সুরুচির মা বললে—আপনার ঘরে ভাত আগলে বসে আছেন।

সরিৎ আর অপেক্ষা না করে সোজা নিজের ঘরে এল, এসে দেখে মেঝেতে আসন পাতা। সামনে ভাত ঢাকা, আর সেই আসনের উপরই বসে ঘুমে ঢুলছেন বৌদি। সরিৎ চেয়ে রইল বৌদির মুখের দিকে। সরিতের মনে পড়ে গেল মায়ের কথা। দেখতে পেল বৌদির মুখে সেই একই দীপ্তি, সেই একই স্নেহ, মায়া মমতার অভিব্যক্তি।

সরিৎ আস্তে আস্তে ডাক দিল—বৌদি—।

ধরমড় করে উঠল মমতা। বললে—ঠাকুরপো—! এসেছ—? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সরিৎ অপরাধীর মত বললে—কাল সব বলব। নিশ্চয়ই তোমার এখনো খাওয়া হয়নি? যাও খেয়ে শুয়ে পড় গে।

মমতা রাগ করে বললে—থাক যথেষ্ট হয়েছে! এখন খেতে বোস দেখি।

সরিৎ আর দ্বিরুক্তি না করে খেতে বসল। কারণ সে জানে—, তাকে কাছে বসে না খাইয়ে, বৌদি এখান থেকে যাবে না।

খাওয়া হয়ে যাবার পর মমতা শুধু বললে—আজ আর কিছু বললাম না বটে, কিন্তু কাল এর জবাবদিহি করতে হবে!

সরিৎ বললে—আচ্ছা—আচ্ছা—যে শাস্তি দিতে হয় দিও। এখন গিয়ে খাও দেখি। যাও।

মমতা চলে গেল। সরিৎ শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু চোখে তার ঘুম এল না। সে রাতটা কাটল তার নানা চিন্তায়।

সারারাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে, শেষ রাতের দিকে সরিৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। জানালা দিয়ে রোদ গায়ে পড়তেই জেগে উঠল। ঘড়িতে তখন আটটা। লাফিয়ে উঠল সে। কারণ কাল রাতেই ঠিক করে ফেলেছে, যে সে আজ সকালে অনিমেষের বাড়ী যাবে। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে জামা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বেরুতেই

দেখে অনিমেষও তাদের বাড়ীতেই আসছে। অনিমেষ কাছে এসে খুব গম্ভীর ভাবে বললে—আমার আজ বিয়ে। তুই যাবি।

সরিৎ বললে—তোর বিয়ে—!

অনিমেষ সংক্ষেপে বললে—হুঁ।

সরিৎ বললে—পাত্রীটা কে?

অনিমেষ বললে—শ্রীমতী হিমালয় ঝরণা সিংহ।

সরিৎ চমকে উঠে বললে—বলিস কী—?

অনিমেষ বললে—হ্যাঁ। বলে চ'লে যাচ্ছিল। সরিৎ ডাক দিয়ে বললে—শোন্। আমিও তোর ওখানে যাচ্ছিলাম।

অনিমেষ বললে—কেন?

সরিৎ বললে—আর কেন নয়। আজ যদি তোর বিয়ে না হত, তাহলে এখনই তোকে এক আছাড়ে গুঁড়ো করে ফেলতাম। তা আজ ভালয় ভালয় বিয়েটা চুকে যাক, কাল তোকে দেখে নেব।

অনিমেষ হেসে বললে—সে কাজটা বরঞ্চ আজই করে ফেল। তাতে আমিও বিয়ের দায় থেকে রেহাই পেয়ে যাই। আর সে বেচারীও বিধবা হবার হাত থেকে বেঁচে যায়।

সরিৎ বললে—ওঃ সে বেচারীর জন্যে দরদের যে অন্ত নেই! সে বিধবা হ'লে তোর কি আসে যায় রে?

অনিমেষ বললে—কিছু না। মাঝখান থেকে আমি যে মারা পড়ব—এই যা। তা আমি মারা পড়ি ক্ষতি নেই, কিন্তু দোহাই তোর, হিমালয়কে বিধবা করিসনি। তারপর হেসে বললে—তা কী ব্যাপার?

সরিৎ বললে—থাক আজ আর সে আলোচনায় কাজ নেই। কিন্তু তোর কী ব্যাপার? এই অঘটন ঘটল কী করে?

অমিমেষ বললে—এখনো ঘটেনি। ঘটবে আজ গোধূলি লগ্নে। লগ্নটা নির্বিঘ্নে পার হোক, পরে সব বলব।

সরিৎ বললে—কবে ঠিক হ'ল?

অনিমেষ বললে—আজই ব্রাহ্মমুহূর্তে। আমি চলি। তুই যাস কিন্তু। বলে অনিমেষ চলে গেল।

সরিৎ দেখল—এই মাঘ মাসেও অনিমেষের মনে নূতন করে মধুমাস এসেছে।

মানুষের মনটা বড়ই বিচিত্র। সব চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হল, মানুষ নিজের মনকে অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারে না। এমন যে গোয়েন্দা পুলিশ, যিনি নাকি দুনিয়ার লোকের গতিবিধি সহজেই বুঝতে পারেন বা খবর রাখেন, তাঁকেই যদি জিজ্ঞেস করা যায়, আপনি আপনার নিজের মনের খবর রাখেন? উত্তরে তিনি নিশ্চয়ই আমতা আমতা করে বলবেন—না, ঠিক সব সময় পারি কই?

মোটের উপর কথাটা দাঁড়াল এই যে, মনের বিচিত্র সব কাণ্ড-কারখানা দেখে, নিজেরই অনেক সময় অবাক হতে হয়।

অনিমেষও অবাক হ'য়েছে। কারণ হিমালয় ঝরণা সিংহের কবল থেকে প্রাণটি নিয়ে, যেভাবে সে ফিরে এসেছে, তাতে এরপর হিমালয়ের চিন্তা তার মন থেকে দূব হয়ে যাবারই কথা। শুধু তাই নয়, সে বাড়ী আসতে আসতে ঠিকই করে ফেলেছিল, বিয়ে তো সে করবেই না, উপরন্তু তার কাছে বিয়ের নাম যে করবে তার সঙ্গে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। তা সে জগবন্ধুই হোক আর যেই হোক।

হরেনবাবু উৎকণ্ঠিত অবস্থায় পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ঘর আর বার করছিলেন। পুত্রকে ফিরতে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। মনে হ'ল যেন বিজয়ী পুত্রকে অভ্যর্থনা করতে এগোলেন। কিন্তু পুত্রের থম্‌থমে মুখের দিকে চেয়ে, আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলেন না।

অনিমেষ কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ করে দিল। হরেনবাবু একটু দূরত্ব বজায় রেখে, পিছন পিছন এসে দরজার ফাঁকে চোখ পেতে রইলেন। দেখলেন—অনিমেষ খানিকক্ষণ নির্জীবের মত গুম্ হয়ে চেয়ারটার উপর বসে

রইল। তারপর উঠে ঘরময় দ্রুত পায়চারি করতে লাগল। হরেনবাবু কিছু বুঝতে না পেরে নিজেও বারান্দায় যথাসম্ভব দ্রুত পায়চারি করতে করতে ব্যাপারটা কী ভাবতে লাগলেন। আবার দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালেন। দেখলেন অনিমেষ তার স্যুটকেস খুলে গেরুয়া কাপড়গুলো বার করে নিয়ে তার দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। হরেনবাবু প্রমাদ গণলেন। তবে কি আবার অনিমেষ গেরুয়ার আড়ালে হারিয়ে যাবে? একটু বাদে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। দেখলেন—

অনিমেষ গেরুয়া কাপড় চোপড় গুলোকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারল খোলা স্যুটকেসটার মধ্যে। তারপর চটপট্ স্যুটকেসটির ডালাটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিল। তারপর পুনরায় সে পায়চারি করতে লাগল। হরেনবাবু কিন্তু এবার আর পায়চারি করলেন না। তিনি একটু খুশি মনে একটি বিড়ি ধরিয়ে ফুরুক্ ফুরুক্ টানতে লাগলেন। ভাবখানা এই যে—বিপদটা আপাততঃ কাটল।

পরদিন ভোর হ'তে না হতেই সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। ঠিকা ঝি কাজ করতে এসেছিল। সে-ই দরজাটা খুলে দিল। জগবন্ধু সোজা উপরে উঠে গিয়ে অনিমেষের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকল—অনিমেষ—অনিমেষ—

অনিমেষ তখন লেপের তলায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল—যেন সে তেনজিং শেরপা আর এড্মণ্ট্ হিলারীর মত হিমালয় অভিযানে চলেছে। সেখানে যাবার আগে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে মহাদেবের তপস্যা করতে ব'সেছে। তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকতে মহাদেবকেই বেছে নেবার কারণ হ'ল—গোটা হিমালয়টাই নাকি মহাদেবের অধিকারে। যাই হোক তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব কৈলাস থেকে নেমে এসে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে যেন বলছেন—যাও বেটা, তুম্হারা অভিযান সফল হোগা।

বাংলায় না বলে হিন্দীতেই বা কেন ম ... জটিলতা
এর কারণ হ'ল যে কয়েকবার মহাদেবের সা-লন— ? ... ঠেই
হিন্দী সিনেমার দৌলতেই। শুধু তাই নয়, ... তা ... বার
লোক। এ সম্বন্ধে সকলেরই একটা অল্প বিস্তর ধার... ণ্ডিত

এদিকে মহাদেবকে যখন একেবারে হাতের কাছেই ... বকর
—তখন এই ফাঁকে আর একটা বরও চেয়ে নিলে মন্দ হ...পণ্ডিত
মহাদেবের হাতের ভারটা অনিমেষ তখনো মাথায় অনুভব করছে!
অনিমেষ খপ্ করে মহাদেবের হাতটা জড়িয়ে ধরে বলতে গেল—
আমাকে ঐ ঘটোৎকচের মত মোটা করে দিজিয়ে বাবা।

অর্থাৎ সেদিনের দেখা ঘটোৎকচ তলাপাত্রের কথাটাই মনে পড়ে গেল অনিমেষের। কিন্তু মুখনিঃসৃত অমৃত বাণীর বদলে, একটা 'মঁ্যাক্' করে শব্দ করে মহাদেব লাফিয়ে পড়ল বিছানা থেকে।

ধড়মড় করে উঠে অনিমেষ দেখল—মহাদেবই বটে। পোষা একটা কালো হুলো বেড়াল। বেড়ালটার পেটটা মোটা বলে, অনিমেষ ওটির নাম দিয়েছিল মহাদেব। শীতের দিনে সেও আরাম করে এতক্ষণ অনিমেষের মাথাটা চেপে শুয়ে ছিল।

অনিমেষ উঠতে না উঠতেই দরজায় পড়ল ধাক্কা। সঙ্গে জগবন্ধুর কণ্ঠ—অনিমেষ—অনিমেষ!

অনিমেষ যেভাবে উঠে দরজাটা খুলে দিল তাতে মনে হ'ল, জগবন্ধু যে আসবেই—এটা যেন সে জানত। আজকের জগবন্ধুকে তার বড় ভাল লাগল। দুয়ার খুলতেই অনিমেষ কিছু বলার আগেই জগবন্ধু বলে উঠল—বাইরে তোকে ডাকছে।

অনিমেষ বললে—কে?

জগবন্ধু সে কথার জবাব না দিয়ে বললে—মেসমশাই উঠেছেন?

অনিমেষ বললে—হ্যাঁ, বাবা খুব ভোরে উঠে চান করে আহ্নিক করেন। তা কী ব্যাপার?

জগবন্ধু বললে—আমি মেসমশাইর কাছে যাচ্ছি। তুই বাইরে গিয়ে ছাখ্। বলে জগবন্ধু চলে গেল।

অনিমেষ আশায় আশঙ্কায় দুলতে দুলতে নীচে নেমে গেল। একদম সদরে গিয়ে দেখল কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তেই অনিমেষের পা থেকে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ উঠে মাথা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেখল—সামনের ফুটপাথের একটা ছোট্ট গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমতী হিমালয় ঝরণা সিংহ !

অনিমেষ কী বলবে, কী করবে ঠিক পেল না। অবশ্য তাকে কিছু আর বলতে হ'ল না, তাকে দেখতে পেয়ে হিমালয়ই কাছে এসে বললে—চলুন, আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা আছে।

অনিমেষ শুধু অব্যক্ত ভাবে বলে উঠল—আবারও প্রশ্ন নাকি ?

হিমালয় বললে—আর প্রশ্ন নয়, এবার ফাইনাল করতে এসেছি। বাবার ব্লাড্ প্রেসারটা আমাকে কমাতেই হবে। কাল থেকে তিনি শয্যা নিয়েছেন। চলুন—বলছি সব।

হিমালয়ের চোখে মুখে রাত জাগার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আসলে ব্যাপারটা হ'ল—অনিমেষরা চলে আসার পরেই গণপতি বাবু অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। এবং তাঁর অসুস্থতা এত বেড়ে গেল যে হিমালয় ঝরণা দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেল। গণপতি বাবুও সময় বুঝে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে হিমালয় ঝরণাই তাঁর অসুস্থতার একমাত্র কারণ। হিমালয় ঝরণার অনুতাপের আর অবধি রইল না। সেও বাবাকে কথা প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিল যে, কালই সে তার ভার লাঘব করবার ব্যবস্থা করবে। অতএব সারারাত ছট্ ফট্ করে ভোর হতে না হতেই জগবন্ধুর বাড়ী এসে উপস্থিত হ'ল। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে অনিমেষের বাড়ী।

অনিমেষ শুধু ভাবল—ভোরের দেখা স্বপ্ন নাকি সফল হয়। অন্ততঃ তার বেলাতে তো হোলই। তবে তফাতের মধ্যে এই—হিমালয় অভিযানে তাকে আর যেতে হ'ল না, হিমালয় নিজেই হেঁটে এল তার কাছে। মহম্মদের কাছে পর্বত আসেনি, মহম্মদকেই নাকি পর্বতের কাছে যেতে হয়েছিল। সেদিক দিয়ে অনিমেষ ভাগ্যবান বৈকি !

আজকাল চণ্ডীমাসীর প্রাত্যহিক কর্মতালিকার মধ্যে জটিলতা বলে কিছু নেই। অতি সোজা ও সরল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই একগাছা ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দেবার নাম করে উঠানে নেমেই যতবার না উঠান ঝাঁট দেয়, তার চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশবার বেশী পণ্ডিত মশাইর বাড়ীর দিকের দরজায় এসে গলা টানা দিয়ে বকর বকর করে। বলা বাহুল্য তার সবগুলো বাক্যবাণের লক্ষ্যই পণ্ডিত মশাই, প্রভাময়ী ও অনুসূয়া। এইভাবে বেলা দশটা অবধি চলার পর পোড়া পেটে কিছু দেবার জন্যে, উনুনটায় আঁচ দিতে হয়। এমন যে ঘড়ি, তাতেও তো দম দিতে হয়! কিন্তু দিলে হবে কি, পেটে কি ভাত যেতে চায়! পেটে তখন যে অনেকগুলো কথা গিজ্‌গিজ্‌ করছে। অতএব সেগুলো উগ্‌রে না দেওয়া পর্যন্ত তো স্বস্তি নেই। তাই সাত তাড়াতাড়ি যা হোক দুটো গলা দিয়ে উদরে চালান করে দিয়েই বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। তারপর এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে, এর কাছে তার কাছে অনুসূয়া ঘটিত কেলেঙ্কারি কাহিনীটির এক সরস ও সালঙ্কার বর্ণনা দিয়ে হাল্কা মনে বাড়ী ফেরে সেই বেলা তিনটার সময়। তারপর ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নেয়। বিশ্রাম করাটা দরকার বৈকি! সারাটা দিন ধকল তো বড় কম যায় না শরীরের উপর দিয়ে! তারপর সেই বিকেল পাঁচটা নাগাদ পাড়ার সেই মাসী পিসীরা একে একে এসে জড় হয় চণ্ডীমাসীর দাওয়ায়। আরম্ভ হয় নানা টিপ্পনীসহ রসালো আলোচনা।

প্রভাময়ী সবই শোনেন। আর না শুনেই বা উপায় কি? তাঁকে শোনাবার জন্যেই তো চণ্ডীমাসীর এত আয়োজন। তা প্রভাময়ীই যদি না শোনেন তবে তার সমস্ত আয়োজনই যে বাজে খরচ হয়ে গেল। কিন্তু চণ্ডীমাসী ক্রমেই হতোদ্যম হয়ে পড়ছে। কারণ গত দু'দিন ধরে অনেকগুলো চোখা চোখা বাণ সে ছুঁড়ে মেরেছে। অথচ একটা বাণও যে প্রভাময়ীকে ঘায়েল করেছে তার প্রমাণ চণ্ডীমাসী কিছু পাচ্ছে না। আরে বাপু মারলে একটু আহা-উহু

মুঠো মুঠো

তো করবি! অথচ ওপক্ষ একেবারে চুপ! তবে—? পিত্তি জ্বলে যায় চণ্ডীমাসীর। তাই আজ সকাল থেকেই সে মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগল। আপন মনে গৃহস্থালী করতে লাগল আর কীভাবে কী কায়দায় শুরু করবে তারই খসড়া তৈরী করতে লাগল। একটু গড়াগড়ি দিয়ে দেহটাকে তাজা করে নিল। বিকেল চারটা সাড়ে চারটা নাগাদ আসরে নামল চণ্ডীমাসী। একেবারে দেয়ালের মাঝখানের দরজায় এসে পণ্ডিত মশাইর বাড়ীর মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে, প্রথমেই মুখবন্ধ হিসাবে মুখ খুলল। মুখ তো খুলল না যেন চড়া সুরের লাউড্ স্পিকারটা হঠাৎ চালু হ'ল।

চণ্ডীমাসী বললে—বলতেই বলে—রঙ্গী কত রঙ্গই না দেখালি! কালে কালে কতই না দেখবো! তা এই আমি বলে রাখছি, আমার বাড়ীতে বসে এ অনাচার করা চলবে না—চলবে না—। বলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল প্রভাময়ীদের ঘরটার দিকে। কাউকে দেখা যায় কিনা। দেখা তো গেলই না, উপরন্তু যাও বা ঘরের দরজাটা এতক্ষণ খোলা ছিল তাও কে যেন বন্ধ করে দিল। জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘি পড়ল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চণ্ডীমাসী। বলে—বলি এ বাড়ীর লোক কি সব মরে গেছে নাকি!

বাগ্ড়া দিল এসে গোপাল। পিছন থেকে গোপাল এসে বললে —মাসী—ও মাসী—

চণ্ডীমাসী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—কী রে!

গোপাল বললে—আমি গলায় দড়ি দেব।

চণ্ডী তেমনি ভাবে বললে—তা দে না! কে তোকে আটকাচ্ছে!

গোপাল বললে—তা হ'লে একগাছা দড়ি কিনে দে।

চণ্ডীমাসী বললে—মরণ আর কি!

গোপাল ঠোঁট উলটে বললে—তা মরব বৈকি!

চণ্ডীমাসীর যত রাগ গিয়ে পড়ল গোপালের উপর। বললে— তুই মর—মর—মর। তুই ম'লে আমারও হাড় জুড়তো, আর পাড়া পড়শীর বুকেও জল ঢালতো। দেখছিস না তুই হচ্ছিস এখন সকলের

চোখের শূল। হুঁ—রাজপুত্তুর জামাই আনবে—রাজপুত্তুর! তা আমিও মরছি না, দেখব কেমন রাজপুত্তুর আনে!

গোপাল অভিমান করে বললে—তা আমি কি দেখতে খারাপ মাসী—?

চণ্ডীমাসী বললে—তুই—! হুঁ—তাই তো বলি—কিন্তু আর বলা হ'ল না। তার আগেই চণ্ডীমাসী ফ্যাচ্ করে হেঁচে ফেলল। শুধু হাঁচি নয়, তার সঙ্গে কাশিও। তা আবার একটা নয়, উপর্যুপরি গোটাদশেক। হাঁচির পর কাশি, কাশির পর হাঁচি। তারপর হাঁচি কাশি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। তখন কোন্টা হাঁচি, কোন্টা কাশি বুঝবার উপায় রইল না। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল চণ্ডীমাসীর। হাঁচিটা যে একটা বাধা, তা ঠিকই। তার সঙ্গে কাশিটাকেও জুড়ে দেওয়া চলে। বিশেষ করে এই রকম ঝগড়ার সময়ে। জ্বালা—জ্বালা—জ্বালা—! জ্বলে পুড়ে যেন খাঁক হয়ে গেল চণ্ডীমাসীর দেহটা। এদিকে আবার লঙ্কা পোড়ার নাক জ্বলুনি গন্ধে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল চণ্ডীমাসীর। সে ডান হাতের চেটো দিয়ে নাকের ডগাটা বার দুই দ্রুত ঘষে নিয়ে উদ্গত হাঁচিটাকে দমন করে তাকাতেই দেখে, পিণ্টু দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে চোঁচাঁ দৌড় দিয়েছে। আর দরজার সামনে একটা লম্বা পাটখড়ির ডগায় সুতো দিয়ে বাঁধা একটা বড় শুকনো লঙ্কা মাটিতে পড়ে জ্বলছে আর হাঁচি কাশি উদ্রেককারী ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে।

চণ্ডীমাসী হাতের আঙ্গুলগুলো মট্ মট্ করে ভেঙ্গে দাঁত কড়মড় করে বললে—মর-মর-মর। কাটা পাঁঠার মত দাপিয়ে দাপিয়ে মর। কিন্তু পিণ্টু তখন দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেছে।

গোপাল দেখল, তার কথা মাসী কিছুই বলছে না। তখন সে একটু তাগিদ দিয়ে বললে—তা কী করব মাসী বল্—? বিয়ে দিবি না গলায় দড়ি দেব?

চণ্ডীমাসী বললে—তোর মুখে আগুন মুখপোড়া। গলায় দড়ি

দিতে যাবি কোন দুঃখে রে হারামজাদা! এর চেয়ে দেখবি কত ভাল মেয়ে নিয়ে আসব।

গোপাল একগাল হেসে বললে—তাহলে তুই বিয়ে দিবি—মাসী?

চণ্ডীমাসী সে কথার উত্তর না দিয়ে সামনের দিকের বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে চড়া গলায় বললে—তাই তো বলি, এক পয়সার মুরোদ নেই, তার আবার লম্বা লম্বা কথা!

কিন্তু ওপক্ষও তো একেবারে নীরেট নয়। তাঁরও তো শরীরটা রক্ত মাংস দিয়েই তৈরী। এই দুদিন মুখ বন্ধ করেই ছিলেন। ভেবেছিলেন এই দুদিনের মধ্যেই যা হোক একটা ঘর দেখে উঠে যাবেন। কিন্তু আর তো সহ্য করা যায় না। ঘরের বন্ধ দরজাটা ঝট্ করে খুলে গেল। পরক্ষণেই গম্ভীর ভাবে বেরিয়ে এলেন প্রভাময়ী। দৃঢ়পদে দাওয়া থেকে, উঠানে নেমে প্রভাময়ী যথাসম্ভব ধীর অথচ সতেজ কণ্ঠে বললেন—এই ক'দিন ধরেই তোমার ঠেস্ দেওয়া কথাগুলো শুনছিলাম দিদি—

যাই হোক এতদিনে কাজ হ'ল তাহ'লে! চণ্ডীমাসী খন্‌খন্ করে বলে উঠল—আমি কিন্তু কারো নাম ধরে কিছু বলিনি বাছা। তুমি যেন গায়ে পড়ে লাগতে এস না বাপু।

প্রভাময়ী বললেন—গায়ে পড়ে লাগতে আসার স্বভাব আমার নয় দিদি। কিন্তু গায়ের উপর এসে পড়লে, তাকে ঠেলে ফেলে দিতে হবে বৈকি! তুমি যে বললে—আমাদের এক পয়সাও মুরোদ নেই, তা সত্যি কথা। কিন্তু পয়সা তোমাদের মত আমাদের না থাকলেও তোমরা আর আমরা কিন্তু এক নই দিদি।

চণ্ডীমাসী মুখটা বিকৃত করে বললে—ওঃ কি আমার রাজরাণী এলেন রে! হুঁ, তবু যদি দুবেলা হাঁড়ি চড়তো! বলতেই বলে—পেটে নেই ভাত, ত'র কথা লম্বা চৌদ্দ হাত!

প্রভাময়ী বললেন—রাজরাণী আমি যে নই, তা তুমিও জানো, আমিও জানি। আর এও সত্যি যে দুবেলা হাঁড়িও হয়তো আমার

চড়ে না। স্কুল মাস্টারের ঘরে ওটা দুঃখের হতে পারে, তা নিয়ে লজ্জিত হবার কিছু নেই। তাই বলে জাল জালিয়াতি করে বিষয় সম্পত্তি করার চেয়ে নীচতাও কিন্তু আর নেই দিদি।

চণ্ডীমাসী বললে—কী বললি, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

প্রভাময়ী বললেন—কথা ঠিকই বলেছি। আমরা কি আর কিছু জানিনা ভেবেছ! সবই জেনেছি—সবই শুনেছি। কিন্তু তা কাউকে বলে বেড়াবার অভ্যাসও নেই আর আমাদের প্রয়োজনও নেই। তবে এটা ঠিক—জালিয়াতের স্ত্রীর তুলনায়, পণ্ডিতের স্ত্রী রাজরাণী বৈকি!

চণ্ডীমাসী ভাবতে পারেনি যে প্রত্যাঘাতটা এমন করে আসবে। তাই সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে গলার পর্দা সপ্তম থেকে নবমে চড়িয়ে বললে—কে—কে বলেছে এই কথা, আমি প্রমাণ চাই।

প্রভাময়ী সংযত কণ্ঠে বললেন—থাক দিদি, কথায় কথায় অনেকখানি নীচে নেমে গেছি। আর নামবার ইচ্ছে নেই। আমরা ভাড়াটে, ভাড়া দিতে পারি থাকব, না দিতে পারি চলে যাব। তোমার সঙ্গে আমাদের আর তো কোনো সম্বন্ধ নেই দিদি!

চণ্ডীমাসী বললে—বেশ তো, সেই ভাড়ার টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় হলেই তো পার।

প্রভাময়ী দ্বিরুক্তি না করে ঘরে চলে গেলেন এবং পরক্ষণে দশটাকার ছ'খানা নোট এনে চণ্ডীমাসীর দিকে ছুড়ে দি. বললেন—এই নাও তোমার টাকা।

টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চণ্ডীমাসী বললে—খুব যে তেজ দেখাচ্ছিস! টাকার অহ্ঙ্কার! ওপরে দর্পহারী ভগবান আছেন, এ সইবে না বলে দিচ্ছি—এ সইবে না।

প্রভাময়ী আর মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁকে থামতে হল। কারণ পণ্ডিত মশাই দ্রুতপদে বাড়ী ঢুকে বললেন—ওগো টাকাগুলো দাও তো, টিউশনি ফেরত বাজার থেকে জিনিসপত্রগুলো অমনি নিয়ে আসবো। স্কুলে যাবার সময় যদি দিয়ে দিতে তাহলে আমাকে আর ঘুরে আসতে হত না—।

প্রভাময়ী নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—থাক, আর কিছু আনতে হবে না। অনুকে আমি শুধু ফুলজল দিয়েই বিদায় করব।

পণ্ডিত মশাই বেশ খুশী হ'য়ে বললেন—তাহ'লে শেখরও কিন্তু খুব খুশী হবে—! পণ্ডিত মশাই আর কী করে বুঝবেন যে এদিকে ব্যাপার অন্যদিকে গড়িয়েছে।

প্রভাময়ী বললেন—সে কথা যাক। তা তুমি বাসার কোনো খোঁজ পেলে?

পণ্ডিত মশাই জিভ কেটে বললেন—এই রে! গতকাল যে এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। একদম ভুলে গেছি।

প্রভাময়ী বললেন—ভুলে তো যাবেই। এই নরকে থেকে থেকে অভ্যাস হ'য়ে গেছে কিনা?

পণ্ডিত মশাই আসতেই চণ্ডীমাসী একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার দরজার সামনে এসে বললে—তা এই নরক ছেড়ে, সগ্‌গে গেলেই তো পার? সেখানে বসে যত খুশি অনাচার কর না! মোদ্দা, আমার বাড়ীতে বসে ওসব বেলাল্লাপানা চলবে না।

—দিদি—! ধৈর্যের বাঁধ গেল ভেঙে। প্রভাময়ী গর্জে উঠলেন। বললেন—ইতরের মুখ থেকে অবশ্য ভদ্র কথা আশা করা যায় না। তবু তোমাকে বলছি—মুখ সামলে কথা বলবে।

চণ্ডীমাসীর মাথার ঘোমটা গেল পড়ে। সে দাঁতমুখ খিঁচে বললে—কী—মুখ সামলে! বলি কত মুখ সামলাবি লা? পাড়ায় যে আর কান পাতা যায় না। ঢি ঢি পড়ে গেছে!

অনুসূয়া এতক্ষণ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। এবার আর না এসে পারল না। সে এসে মায়ের হাত ধরে বলতে লাগল—চুপ কর মা, চুপ কর—।

প্রভাময়ী তার হাতটা একটা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে চণ্ডীমাসীকে বললেন—তাও তুমিই রটিয়েছ—।

পণ্ডিত মশাইও 'থ' বনে গিয়েছিলেন। এবার তিনি সক্রিয় হ'য়ে উঠে প্রভামায়ীকে বললেন—আঃ থামো—থামো—। ঘরে চল—।

ঘরে—হঠাৎ পণ্ডিত মশাই কেঁপে উঠলেন। সদর দিয়ে বাড়ীর ম সেই তখন ঢুকছে শেখর। শেখর ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে! ন যেন ঝগড়ার মধ্যে তার অবস্থিতিটা মোটেই শোভন নয়। ত শেখর'—। এগোবে কি পেছুবে ঠিক করতে পারছিল না। সার আলো-

এদিকে অনুসূয়া যেমন মায়ের হাত ধরে একটানা বলছি- র্ত আলো চল মা—ঘরে চল। অন্যদিকে চণ্ডীমাসীর মুখেও তখন খৈ ফুটা- ন্ধকারটা কী আমি রটিয়েছি! রটিয়েছি বেশ করেছি! কি মিথ্যে রটিয়েছি. সেদিন বিকেলে তোর মেয়ের জন্যে টেক্সি নিয়ে নাগর আসেনি? আজ টেক্সি নিয়ে আসবে, কাল দল বেঁধে আসবে, বাড়ীটাকে যেন বেন্দাবন বানিয়ে ফেললে গা—! অনুসূয়া কাঁপতে লাগল থর থর করে। তার মাথাটা যেন ঘুরতে লাগল। চণ্ডীমাসীর বিষ নিশ্বাসে যেন সে ক্রমেই অসাড় হয়ে পড়তে লাগল।

শুধু পণ্ডিত মশাই শেখরকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, চণ্ডীমাসীর কথাগুলো নিশ্চয়ই শেখর শুনতে পেয়েছে। তিনি কী করবেন ঠিক পেলেন না। তিনি একবার হাত জোড় করে চণ্ডীমাসীকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিফল হ'লেন। তারপর তিনি প্রভাময়ীকে বললেন—ওগো শেখর এসেছে, শেখর—। পরক্ষণেই তিনি শেখরকে আহ্বান জানালেন—শেখর—শেখর এসো—

এদিকে শেখরের নাম শুনে প্রভাময়ীও চমকে উঠলেন। আর অনুসূয়ার চোখটা কেমন যেন অন্ধকার করে এল। সে 'মা' বলে একটা ডাক দিয়েই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'অনু'—'অনু' বলে আর্ত চীৎকার দিয়ে প্রভাময়ী তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। পণ্ডিতমশাইকে বললেন—ওগো দেখ দেখ, অনু যেন কেমন করছে। পণ্ডিত মশাই বলে উঠলেন—অনু! বলে দ্রুত কাছে এলেন। শেখরও তাঁকে অনুসরণ করল। চণ্ডীমাসী এই ফাঁকে নিজের ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করে দিল।

পণ্ডিত মশাই একবার অনুসূয়ার কাছে বসে অনু—অনু—বলে

র্ত চীৎকার করে উঠলেন। তারপর তড়িৎ গতিতে উঠে শেখরের আ দু'টো ধরে আকুল ভাবে বলতে লাগলেন—শেখর—শেখর—।

মশাই বলতে চেয়েছিলেন, যা শুনেছ সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—। খুব খুশীনি তা বলতে পারলেন না, তিনি শেখরের হাত দুটো ধরে ব্যাপাউ করে কেঁদে ফেললেন।

শখর এই সত্যাশ্রয়ী ধর্মাশ্রয়ী সরলপ্রাণ মানুষটির হাত ধরে জল চোখে বলে উঠল—আমি এসব বিশ্বাস করি না পণ্ডিত মশাই—বিশ্বাস করি না।

পণ্ডিত মশাই দু'হাত দিয়ে, শেখরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের চোখের জলে, পুঞ্জীভূত পঙ্কিলতা মুহূর্তে যেন ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে গেল।

অনুসূয়াকে সুস্থ করে শেখর যখন রাস্তায় পা বাড়াল, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যেই বোধহয় রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো না জ্বলাতে, বাগবাজার অঞ্চলটা যেন কালো রংয়ের চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। তার উপর কলকাতার শীতকালীন ধোঁয়া যেন পথ ঘাটে রহস্যের জাল বিছিয়ে রেখেছে। চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল শেখরের। হাত দিয়ে চোখ দু'টোকে রগড়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকাল। দেখল শুধু ধোঁয়া আর অন্ধকার। নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে দেখল সেই একই অন্ধকার আর ধোঁয়া যেন জট পাকিয়ে রয়েছে। একটা মটর সতর্কতা জ্ঞাপক হর্ন দিতে দিতে আসতে দেখে, শেখর রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়াল। মটরটা চলে যেতেই সেই অন্ধকার, আর ধোঁয়ার সঙ্গে কিছুটা ধুলো মিশিয়ে দিয়ে গেল। রাস্তার আশে পাশের বাড়ী ও দোকান থেকে ছিটকে আসা আলো তার সঙ্গে মিশে একটা আলো-আঁধারি মায়ার সৃষ্টি করল। শেখরের অন্তরেও চলেছে এই আলো আঁধারির খেলা। মমতার সন্দেহ—স্বকর্ণে শোনা চণ্ডীমাসীর বর্ণনা—, শেখরের মনকে অন্ধকার করে ফেলতে চাইছে। পরক্ষণেই অনুসূয়ার অচেতন নিষ্পাপ মূর্তি, নিষ্পাপ পণ্ডিত

মশাইর আকুল আকূতি, প্রভাময়ীর নীরব চোখের জল সেই অন্ধকারকে যেন মুহূর্তে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শেখরের কানে যেন এখনো পণ্ডিত মশাইর কথাগুলো লেগে আছে—'শেখর'—'শেখর'—।

কাঁটাপুকুর লেন থেকে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়তেই রাস্তার আলো-গুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। জমাট অন্ধকারকে যেন মুহূর্তে আলো দিয়ে ঢেকে ফেলা হ'ল। এই তো প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্ধকারটা স্বাভাবিক, আলোটা একটা ব্যবস্থা মাত্র।

তাই তো আলোর জন্যে এত কাড়াকড়ি। অন্ধকারের বিরুদ্ধে চলে নিত্য নূতন কত অভিযান। অথচ অন্ধকার আর আলো চলে পাশাপাশি। যেখানে অন্ধকার সেখানেই আলো। অন্ধকার আছে বলেই আলোর এত জৌলুস—এত তার গর্ব। এত সবার প্রিয়।

চণ্ডীমাসী অন্ধকার, পণ্ডিত মশাই আলো।

রাস্তার আলো জ্বলে উঠতেই, শেখরের মন থেকে জমাট অন্ধকারটা দূর হ'য়ে গেল।

বহুদিনের রোগী গোপনে কুপথ্য খেয়ে রোগ বাড়িয়ে ফেলে যেমন লজ্জায়, আর ভয়ে, কাউকে সেকথা প্রকাশ করতে পারে না, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছে সরিতের। সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হ'ল, তার এই অস্থির অবস্থা দেখে, যে কেউই তাকে বিয়ে-পা· ।। মনে করতে পারে। আজকের অস্থিরতার একটু কারণও আছে। ঘটনাটা কতদূর গড়িয়েছে তা বুঝবার জন্যে বৌদির কাছে নানান ছলে জেরা করে যা জানতে পেরেছে, তাতে সে এখনো যে পাগল হয়ে যায়নি কেন সেইটাই আশ্চর্য। দাদা গেছেন সেখানে তদন্ত করতে। আর সেখানে ঘুনাক্ষরেও যদি সেই কেলেঙ্কারির কথাটা প্রকাশ হয়, তাহলে তার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। এইসব কথাই সরিৎ নিজের ঘরে পায়চারি করতে করতে ভাবছিল—,এমন সময় টুটুল এসে হাজির হ'ল। না এসেই বা বেচারী কী করবে—! ছোড়দার বিয়ে হবে, নূতন বৌদি আসবে—ওঃ কত মজাই যে হবে!

কিন্তু হঠাৎ যে কিসে থেকে কী হয়ে গেল, বাড়ীটাতে যেন একটা থম্‌থমে ভাব বাসা বেঁধেছে! সে-সব কথা না বুঝতে পারলেও, এটা বুঝেছে, কোথায় যেন কী একটা গোলমাল হয়েছে। তবে কি নূতন বৌদি আসবে না? সে কতই না কল্পনা করে রেখেছিল। নূতন বৌদি এলে সে তার রুমনী ঝুমনীকে দেখাবে, মন্টি বিড়ালটাকে দেখাবে—আরও কত কি—! নাঃ ব্যাপারটা তাকে জানতেই হবে। তাই সে ছোড়্দার শরণাপন্ন হ'ল। কিন্তু এসে দেখে, ছোড়্দার মেজাজটা তেমন সুবিধের নয়! একটু দমে গেল। সে বার কয়েক ছোড়দার পিছনে পায়চারি করে আস্তে আস্তে ডাক দিল—ছোড়্দা—, জবাব নেই। আর একটু জোরে ডাক দিল—ছোড়্দা—, এবারেও জবাব নেই—। এবার বেশ গলা চড়িয়েই ডাকল—ছোড়্দা—।

খিঁচিয়ে উঠল সরিৎ। বললে—কী—চেঁচাচ্ছিস কেন—?

ঘাবড়ে গিয়ে টুটুল বললে—বাবে, চেঁচালাম কোথায়—?

সরিৎ ধমক দিয়ে বলে উঠল—একশ বার চেঁচিয়েছিস, দু'শ বার চেঁচিয়েছিস। চেঁচিযে চেঁচিযে আমার মাথাটা খারাপ করে দিলে—, আবার বলে—চেঁচালাম কোথায়! কী—কী বলছিস—বল—।

টুটুল অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—বলছিলাম কি নূতন বৌদি কবে আসবে?

সরিৎ বললে—কোনোদিন আসবে না, আসতে পারে না। এ বাড়ীতে তার প্রবেশ নিষেধ।

টুটুল একটু সাহস পেয়ে বললে—নূতন বৌদি দেখতে নাকি খু-উ-ব সুন্দর—?

সরিৎ বললে—সুন্দর না হাতী। খেঁদি, পেঁচী, বিট্‌কেল, কদাকার—খবরদার বলছি, ফের যদি নূতন বৌদি নূতন বৌদি করবি তো, তোকে কেটে ফেলব!

টুটুল এবার ভয় পেয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—ও বৌদি —বৌদি—দেখনা ছোড়্দা কীরকম করছে—!

চেঁচামেঁচি শুনে মমতা ছুটে এল। এসে বললে—কী ব্যাপার? কী হয়েছে—?

টুটুল এবার আশ্রয় পেয়ে মমতার কোলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—দেখনা বৌদি, আমাকে শুধু শুধু কেটে ফেলতে চাইছে—!

মমতা সরিৎকে বললে—তোমার কী হয়েছে বলত?

সরিৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—কী আবার হবে?

মমতা বললে—বিয়ে পাগলা অনেক দেখেছি, তাই বলে এমন বদ্ধ পাগল কিন্তু আর দেখিনি ঠাকুরপো।

সরিৎ বললে—কী—আমি বিয়ে পাগলা!

মমতা হেসে বললে—তাকি আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? তবু যদি একবার চোখের দেখা দেখতে, তাহলে তো বোধহয় রাঁচিতেই পাঠাতে হ'ত!

সরিৎ বললে—রাঁচীতে যাবার দরকার নেই, এখানেই এখন সুব্যবস্থা হয়েছে। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পার।

মমতা হেসে বললে—আমার তো আর তোমার মত বিয়ের চিন্তায় চিন্তায় মাথা খারাপ হয়নি?

সরিৎ বললে—আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, আমি ঐ সব ছাই ভস্মই চিন্তা করছি বসে বসে! আমার বলে অন্য চিন্তা।

মমতা বললে—কী এমন চিন্তা শুনি?

সরিৎ কী বলবে ভেবে পেল না। অবশেষে চট্ করে বলে ফেলল—আরে বাবা, অফিসের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা সামনে—

মমতা হেসে বললে—তার চেয়েও বড় পরীক্ষা তোমার সামনে—। বি-য়ে-(এ) পরীক্ষা! কী বলো?

সরিৎ নাজেহাল হয়ে বললে—যা খুশি বল। আমি চললাম।

মমতা বললে—ঠাকুরপো—ঠাকুরপো—শোনো—শোনো—

সরিৎ বললে—কী বলবে বলো।

মমতা বললে—তোমার বন্ধু সেই অনিমেষানন্দের তো বিয়ে হয়ে গেছে না?

সরিৎ বললে—হবেই তো।

মমতা বললে—ওঃ তাই বলো। তাতেই তোমার মনটাকে আরো খারাপ করে দিয়েছে। চোখের উপর দেখলে কিনা, কেমন নাদুস-নুদুস আস্ত একটি হিমালয় হেঁটে এসে, লিক্‌লিকে স্বামীজীর গলায় ঝুলে পড়ল। আর তোমার বেলায়ই যত বিপত্তি!

সরিৎ বললে—তুমি ঐ দুঃখ নিয়েই থাকো, আমার অন্য কাজ আছে। বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মমতাও হাসতে হাসতে টুটুলকে নিয়ে নিজের ঘরে গেল। গিয়ে দেখে, শেখর চুপ করে খাটের উপর বসে আছে।

মমতা বললে—কখন এলে—?

শেখর গম্ভীর ভাবে বললে—এই খানিকক্ষণ—!

মমতা বললে—ওখানে গিয়েছিলে—?

শেখর বললে—হ্যাঁ।

মমতা বললে—কী খবর—?

শেখর বললে—কোনো খবরই নেই।

মমতা বললে—তার মানে, তুমি কোনো খবরই নিতে পারনি?

শেখর বললে—দেখ মমতা, খবর হয়তো একটা আছে. কিন্তু সেটা যে কোন্ ধরনের খবর আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

মমতা বললে—তাহলে তুমি গিয়ে করলেটা কী শুনি?

শেখর বললে—কিছুই করিনি।

মমতা বললে—তোমাদের দুটি ভাইকে দিয়ে যদি কোনো একটা কাজ হয়।

শেখর বললে—ও আমি পারব না, এই গোয়েন্দাগিরি করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

মমতা বললে—নাঃ, দেখছি আমাকেই যেতে হচ্ছে।

শেখর বললে—বরঞ্চ তাই যাও।

মমতা বললে—অগত্যা যেতেই হবে। দেখবে, আমি যাব আর সমস্ত খবরটি নিয়ে চলে আসব।

শেখর বললে—আমার মনে হয়, তোমার একবার সেখানে যাওয়াই উচিত। তাতে তোমার ধারণাটা বদলেও যেতে পারে।

মমতা বললে—আমিও মনে প্রাণে সেই কামনাই করছি। যাকগে, আজ তো রাত হয়ে গেছে, কাল বিকেলেই যাব।

শেখর বললে—আচ্ছা। বলে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে মনে হল দরজার আড়াল থেকে কে যেন সরে গেল। শেখর অবাক হয়ে বললে—কে—? সাড়া নেই--। বারান্দায় বেরিয়ে শেখর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কোথাও কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে এসে মমতাকে বললে—দেখ সুরুচির মাকে একটু শাসন করা দরকার হয়ে পড়েছে। আড়ি পেতে ঘরের কথা শুনবার অভ্যেসটা ঝি চাকরের পক্ষে অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু মমতাকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে শেখর বললে—তুমি হাসছ! কথাটা কি ঠিক নয়?

মমতা হেসে বললে—সে শাসন করতে হয় আমি করব, তুমি কিছু বলতে যেওনা যেন।

শেখর আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। মমতাও হেসে সরিতের খোঁজে গেল।

—আশায় বসেছেন কাক, পাকলে খাবেন বেল। তা বেল পাকলে কাকের কী? সে গুড়ে বালি। তারাও সব জেনে গেছে।

পিণ্টু অবাক হ'য়ে একবার তাকাল। তারপরই জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করল—আফ্রিকার জঙ্গলে অনেক রকমের অদ্ভুত জন্তু জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার জঙ্গলে অনেক রকমের অদ্ভুত জন্তু জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পর দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে অনুসূয়ার কাছে পড়তে বসেছে পিণ্টু। আর চণ্ডীমাসী তার দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে মালা জপতে জপতে মাঝে মাঝে দেয়াল ডিঙিয়ে কথাগুলো ছুঁড়ে মারছে।

পিণ্টু পড়তে পড়তে হঠাৎ অনুসূয়াকে জিজ্ঞেস করল—আমাদের বাড়ীতেও তো ওরকম জানোয়ার দেখতে পাওয়া যায়—না দিদি? বলে চণ্ডীমাসীর ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিল।

অনুসূয়া ধীরভাবে বললে—তুই ঘরে গিয়ে পড় পিণ্টু।

অনুসূয়ার পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে পিণ্টু উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে—তোর কী হয়েছে দিদি?

এমন সময় রান্নাঘর থেকে ডেকে প্রভাময়ী বললেন—পিণ্টু, বাইরে হিমের মধ্যে বোস না। ঘরের মধ্যে পড়তে বোস।

পিণ্টু বললে—আমি তো সেই কথাই দিদিকে বলছি মা। কিন্তু দিদি যেতে চাইছে না।

প্রভাময়ী বললেন—দিদিকেও ঘরে আসতে বল।

পিণ্টু বললে—চল দিদি।

অনুসূয়া বললে—তুই গিয়ে বোস্, আমি আসছি।

এমন সময় মানসী এসে উপস্থিত হ'ল। বললে—কিরে অনু, অমন চুপচাপ যে?

অনুসূয়া বললে—আয়, বোস্, তুই ঘরে যা পিণ্টু।

পিণ্টু ঘরে যেতে যেতে বললে—দেখনা মানসীদি, দিদি না—যেন কেমন হয়ে গেছে! ব'লে ঘরে চলে গেল।

মানসী বললে—শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে এসেছিলেন। ফিরিয়ে দিলাম। তোর বিয়ে, আমি কি না দেখে যেতে পারি?

অনুসূয়া একটু ম্লান হেসে বললে—তাদের মিছি মিছি ফিরিয়ে দিলি ভাই।

মানসী অবাক হয়ে বললে—কেন—একথা বলছিস কেন?

ওদিক থেকে তখন ভেসে এল চণ্ডীমাসীর কণ্ঠ—বলতেই বলে, অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে, অতি বড় হয়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে।

অনুসূয়া মানসীকে বললে—ঐ শুনছিস, কী সব বলছে?

মানসী বললে—কী ব্যাপার বল্ দেখি?

অনুসূয়া বললে—একটু কান পেতে থাক, তাহলেই সব বুঝতে পারবি।

ওদিকে চণ্ডীমাসী জপের মালাটা কুলঙ্গীতে তুলে রাখবার আগে বার কয়েক কপালে ঠেকিয়ে বললে—এখন চণ্ডীমাসীর সব তাতেই দোষ। এখন আমি দু'চোখের বিষ হয়েছি। কিন্তু এই চণ্ডীমাসী না থাকলে কোথায় থাকতিস সব? তাই তো বলি, তোর শিল, তোর নোড়া, ভাঙব তোরই দাঁতের গোড়া!

অনুসূয়া বললে—শুনলি?

মানসী বললে—শুনলাম, কিন্তু বুঝলাম না কিছুই।

অনুসূয়া বললে—আমিও রাতদিন চব্বিশ-ঘণ্টা শুনছি, কিন্তু মানেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পারছি, আমার কপালে একটা কলঙ্কের দাগ পড়ল, যার আমি বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত জানি না। কথা বলতে গিয়ে অনুসূয়ার গলাটা ভারি হ'য়ে এল।

মানসী বললে—তা মেসোমশাই মাসীমা কিছু বলেন না?

অনুসূয়া একটু ম্লান হেসে বললে—জানিস তো, পাঁকের ভেতর যত ঢিল ছুঁড়বি, তত ছিটকবে?

মানসী বললে—তাই বলে এসব নোংরামি চুপ করে স'য়ে যেতে হবে?

অনুসূয়া বললে—আমরা চেষ্টা করছি এখান থেকে চলে যাবার। বাবা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

—ত্যাজ দুর্জনঃ সংসর্গম্— দুর্জনের সংসর্গ সর্বদাই পরিত্যাজ্য। বলতে বলতে পণ্ডিত মশাই এসে উঠানের মধ্যে দাঁড়ালেন। পণ্ডিত মশাইর হাসিখুশি মুখ দেখে অনুসূয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল—বাবা, বাড়ী খুঁজে পেলে?

পণ্ডিত মশাইর কথার আওয়াজ পেয়ে প্রভাময়ীও বাইরে এলেন এবং অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে বললেন—ওগো, বাড়ীর খোঁজ পেলে?

পণ্ডিত মশাই একগাল হেসে মাথা নেড়ে বললেন—পেয়েছি, পেয়েছি—।

প্রভাময়ী বললেন—তাহলে জিনিসপত্র সব গোছাতে আরম্ভ করি ?

পণ্ডিত মশাই বললেন—তা কোথায়, কী বৃত্তান্ত কিছুই শুনলে না, আগেই জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে ?

প্রভাময়ী বললেন—যেখানেই হোক, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

পণ্ডিত মশাই বললেন—আহা-হা, যেখানে সেখানে নয়, এ আমার এক পুরোনো ছাত্রের বাবার বাড়ী। দোতলার উপরে ছু'খানা মোজায়েক করা ঘর, প্রচুর আলো হাওয়া, এটা যদি হয় নরক, তবে সেটা হবে স্বর্গ। অথচ ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা। তাও আমাকে পুরো দিতে হবে না। তার ছেলেকে সংস্কৃত পড়াব, তাতেই শোধ হবে তিরিশ টাকা। বলি কেমন—হলত ? তুমি তো মনে কর আমার কোনো দিকে খেয়ালই নেই !

প্রভাময়ী বললেন—সে কথা কি আমি বলেছি ?

মানসী বলে উঠল—তা কোথায় মেসোমশাই ?

পণ্ডিত মশাই সভয়ে বলে উঠলেন—চুপ, শুনতে পাবে।—বলে চণ্ডীমাসীর ঘরটা দেখিয়ে দিলেন।

যদিও সেদিন শেখরের ব্যবহার দেখে প্রভাময়ী ও পণ্ডিত মশাই ছুজনেই আশান্বিত হয়েছিলেন যে কালনাগিনীর বিষোদ্‌গারেও শেখরকে প্রভাবিত করতে পারেনি, তবু মানুষের মন না—যেন ঠুন্‌কো কাঁচ। কখন ভেঙে যায় বলাতো যায় না। তাই প্রভাময়ী উঠে পড়ে লেগেছেন অন্ততঃ বিয়ের আগে যাতে এবাড়ী ছেড়ে যেতে পারেন। তাঁর সবচেয়ে ভয়—বিয়ের দিন যদি একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে ! পণ্ডিত মশাইরও সেই একই আশঙ্কা।

দরাজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাদা বৌদির কথা আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করেছিল সরিৎ। কিন্তু তাঁরা এত মৃত্নস্বরে কথা বলেছিলেন যে সব কথা সরিতের শ্রুতিগোচর হতে পারেনি। তবে সবটা না শুনলেও এটা বুঝেছে, দাদা বোধহয় বিশেষ কিছু জানতে পারেনি।

কিন্তু তারপরে কী ঠিক হ'ল, তা সঠিক কিছু বুঝতে পারল না। মনে হ'ল যেন পরবর্তী তদন্তের ভারটা বৌদি স্বয়ং নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাই যদি হয়—তাহলেই তো হয়ে গেল!

অতএব আপাততঃ একটা ফাঁড়া কাটলেও, দ্বিতীয় ফাঁড়া কাটবে কিনা, এ বিষয়ে সরিতের ঘোরতর সন্দেহ র'য়ে গেল। শুধু সন্দেহ নয়, সরিৎ যত ভাবে, তত তার চোখের সামনে বিভীষিকাময় দৃশ্য ফুটে উঠতে লাগল। কারণ বৌদির জেরা যে কী বস্তু, তা তো সরিৎ হাড়ে হাড়েই জানে। দাদা যা পারেননি, বৌদি নির্ঘাত সব বের করে আনবেন। আর একটা জোরালো কারণ হ'ল, মার্জনীধারিণী যে তার পরিচয় জানতে পেরেছে, এতো বোঝাই গেল। না হলে সে তাদের বাড়ীতে আসবে কেন? নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল। যদিও কখনো সে সরিতের নাম বলেনি, কিন্তু বৌদির জেরার সামনে পড়লে কি আর না বলে পারবে? আজ পর্যন্ত কোনো কাজ সরিৎ গোপনে করে সারতে পারেনি। সরিতের মনে আছে, সে যেদিন প্রথম সিগারেট খেয়েছিল। খেয়েছিল বোটানিকেল গার্ডেনে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে। অথচ বাড়ী ফেরার পর, বৌদি ঠিক ধরে ফেলেছিলেন। কেমন করে যেন তিনি সব টের পান। দাদাও কি রেহাই পান নাকি? সেবার দাদা পেটের গোলমালে খুব ভুগছিলেন। বৌদির নিষেধ ছিল ঘরের খাবার ছাড়া, বাইরের কিছু খেতে। এদিকে দাদা একদিন গোপনে বন্ধুদের সঙ্গে গার্ডেন পার্টি করে খুব খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলেন। তারপর যা হ'ল, তাতে দাদার অসহায় অবস্থা দেখে, সরিতের বড় মায়া লেগেছিল! এদিকে পেটের যন্ত্রণায় ভুগছে, ওদিকে বৌদি অভিমান করে বললে—আমাকে শাস্তি দেবার জন্যই তো তুমি এসব করছ,—অতএব শাস্তিটা তুমি নিজের চোখেই দেখে আনন্দটা উপভোগ কর। বলে একটানা দুদিন উপোস করে রইল। বেচারী দাদার অবস্থাটা কল্পনাতীত।

সরিৎ অনেক সময় ঠাট্টা করে বলে—তুমি উকীল হ'লে না কেন বৌদি?

বৌদি হেসে বলেন—তাহলে উকীল বেচারীদের ভাত মারা যেতো যে!

এ হেন বৌদি যদি চণ্ডীমাসীর কাছে যায়, তবে কি আর তার জানতে বাকী থাকবে কিছু?

পরদিন অসুখের ভান করে অফিসে না গিয়ে ঘরে শুয়ে রইল। পরিণতি কতদূর গড়ায় তা স্বচক্ষে না দেখতে পারলে যেন স্বস্তি নেই।

অতএব বৌদির কাছে খবরটা দিয়ে সরিৎ যথারীতি সকাল থেকে বিছানায় শুয়ে রইল। মমতা উদ্বেগের সঙ্গে এসে জিজ্ঞেস করলে—কী হ'ল—জ্বর-টর হয়নি তো?

সরিৎ বললে—হয়নি কিন্তু হতে কতক্ষণ! মাথাটা খুব ধরেছে কিনা।

মমতা তবু বার কয়েক বুকে কপালে হাত দিয়ে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে—নাঃ জ্বর হয়নি বটে! তবে মাথা যদি ধরেই থাকে তবে আর অফিসে গিয়ে কাজ নেই।

সরিৎ বলে উঠল—ধরেই থাকে মানে? তোমার কি তাতে কোনো সন্দেহ আছে নাকি?

মমতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—কিছুমাত্র না। বরঞ্চ ধরাটাই স্বাভাবিক।

সরিৎ বললে—কেন—কেন—স্বাভাবিক কেন?

মমতা বললে—আহা-হা, সেই যে কী বলেছিলে-না অফিসের ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা নাকি সামনে—সেই চিন্তায় চিন্তায় আর কি! বলে মমতা হেসে চলে গেল।

সরিৎ ভাবল, কী জানি—টের পেল নাকি! তা হোকগে, সে আর আজ অফিসে যাচ্ছে না! দশটা অবধি কোনোমতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে শেখর অফিসে চলে যাবার পর সরিৎও উঠে পড়ল বিছানা থেকে। কতক্ষণ আর সুস্থ শরীরে শুয়ে থাকা যায়! সরিৎ একটু ঘুরে আসবার জন্যে বাইরে বেরুচ্ছিল, মমতা দেখতে পেয়ে বললে—আবার এই রোদে কোথায় বেরুচ্ছ?

সরিৎ চটকরে বললে—যাই একবার ডাক্তারের কাছে। তুমি তো আর বিশ্বাস করলে না, দেখি ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করেন কিনা!

মমতা বললে—তা না করলেও, রোদে ঘুরলে যে মাথা ধরে, এটা বিশ্বাস করি। অতএব, কোথাও তোমার গিয়ে কাজ নেই।

সরিৎ ঘুরে বললে—সত্যিই তুমি বিশ্বাস করনা যে আমার মাথা ধরেছে!

মমতা বলে উঠল—করি বাপু করি—একশ বার করি। আরে বাবু এটা তো শুধু মুখবন্ধ, এরপর কত মাথা ধরবে, কত অফিস কামাই হবে!

সরিৎ রেগে গিয়ে বললে-- এদিকে আমি মাথা ধরায় মরে যাচ্ছি, আর যত সব ইয়ে—বলে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

মমতা হাসতে লাগল। কারণ সে যতবার সরিতের ঘরের সামনে এসেছে, ততবারই সরিৎকে হয় বসে থাকতে নয়তো ঘুরতে দেখেছে আর তাকে দেখতে পেলেই মাথা চেপে ঝুপ্‌ করে শুয়ে পড়েছে। আসলে কাল যে তাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপ আলোচনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সরিৎই শুনছিল, এবিষয়ে মমতা নিঃসন্দেহ। আর তারই পরিণতিটা দেখবার জন্যেই সরিতের আজ মাথা ধরেছে। হঠাৎ মমতার মনে একটা সন্দেহ উঁকি মারল। যাকে কোনোদিন চোখের দেখাও দেখেনি, তার জন্যে এতটা উতলা হওয়াটা কি সরিতের পক্ষে স্বাভাবিক হচ্ছে! না বিয়ের জন্যে ভেতরে ভেতরে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল! তাই বা কী করে হবে! এর আগে তার আচার আচরণে এর কোনো লক্ষণই তো প্রকাশ পায়নি!

সরিৎ খানিকক্ষণ এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে হতাশ হয়ে গেল। এমন কাউকেই পাওয়া গেল না—যার সঙ্গে দুটো কথা বলে সময়টা কাটাতে পারবে। কারণ বন্ধুবান্ধবদের তো আর তার মত মাথা ধরার কোন কারণ ঘটে নি! তারা যে যার কাজে চলে গেছে। অগত্যা সরিৎ বাড়ীর দিকে ফিরে চলল।

—নমস্কার স্যার।

চমকে উঠেই সরিৎ হেসে ফেল্‌লে।

গোঁফে তা দিতে দিতে লাঠি হাতে হন্‌ হন্‌ করে আসছিলেন অটল মোক্তার। সরিতকে দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

সরিৎ বললে—বলুন।

অটল মোক্তার বললেন—তা কোন্‌ কোর্টে আছেন স্যার!

সরিৎ অবাক হয়ে বলল—কোর্ট!

অটল মোক্তার নিজের খেয়ালে বলে যেতে লাগলেন—ভাল—ভাল। অল্প বয়স। এই তো উন্নতি করবার সময়। তবে একটা কথা স্যার, রায় দেবার আগে নিজের বিবেকের কাছে একবার জিজ্ঞেস করে নেবেন। বিবেকের রায় বড় রায়। তা বাদী বিবাদী পক্ষের উকীল মোক্তাররা যা বলে বলুক না কেন! তবে বলতে পারেন, আইন তো মেনে চলতেই হবে। তা ঠিক কথা। তা দেখুন, মানুষের জন্যেই তো আইন তৈরী হয়েছে। আইনের জন্যে তো আর মানুষ জন্মায় নি? আইনের গোড়ার কথাই হোল—দোষী দু একটি খালাস পায় পাক. কিন্তু আইনের প্যাঁচে পড়ে, নির্দোষী যেন সাজা না পায়। কী বলেন? সত্যি কিনা? আরে মশাই আইনের বই আমি গুলে খেয়েছি। না হলে কি আর, অমন জাঁদরেল মোক্তার হতে পারতুম! তখন আমার দাপটে সমস্ত কোর্টটা থর্‌ থর করে কাঁপত। আমি কেন কোর্ট ছেড়েছি জানেন?

সরিৎ বললে—আজ্ঞে না।

অটল মোক্তার বললে—আপনার ভাগ্যি ভাল, যে ইদানীং কালে আপনি হাকিম হয়েছেন। না হলে আপনাকেও জানতে হ'ত! তবে শুনুন—। সেবারে লুইস্‌ সাহেবের এজ্‌লাসে একটা শক্ত মামলা চলছিল। মামলাটা হল, শ্রীমতী নয়নতারা হাঁটুই তার স্বামী শ্রীমন্ত হাঁটুইর নাকটা এক কোপে কেটে দিয়েছে। আমি ছিলাম আসামী নয়নতারা হাঁটুইর পক্ষে। আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি,—নাক কাটে নি। তখন বিপক্ষের উকিল হাকিমকে বললেন—তা হলে

শ্রীমন্তর নাকটা গেল কোথায় ? শ্রীমন্তর নাকি বাঁশীর মত একটা নাক মুখের উপর শোভা বর্ধন করছিল। এখন তো সেখানে সেটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কথাটা ঠিক, তাহলে নাকটা গেল কোথায় ? তখন আমি বললাম—কাটেনি, শ্রীমন্তর নাকটা কাটা গেছে। শ্রীমন্ত আর নয়নতারার মধ্যে খুব সদ্ভাব সম্প্রীতি ছিল। ঘটনার দিন শ্রীমন্ত বিদেশ থেকে চাকরী করে বাড়ী ফিরেছে। কিন্তু নয়নতারার জন্যে রূপোর গোট না আনাতে নয়নতারা বটি নিয়ে ঘরের দুয়ারে বসেছিল, রূপোর গোট না দিলে শ্রীমন্তকে ঘরে ঢুকতে দেবে না, জোর করে ঘরে ঢুকতে গিয়েই নয়নতারার বটিতে লেগে শ্রীমন্তর নাকটা পড়ল কাটা। কিন্তু হুজুর, নাকটা কাটা যেতেই নয়নতারা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। এতেই বোঝা যায় তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিবিড় প্রেম ছিল, আর এটা তার স্বেচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু সাহেবের হঠাৎ খট্‌কা লেগে গেল—ঐ ডুকরে কথাটা শুনে। সে বলে উঠল 'ডুকরে'— ? হোয়াট ডু ইউ মিন্ বাই ডুকরে— ?

আমি বললাম—ডুকরে মানে হাউ হাউ করে কেঁদেছে।

সাহেবকে যেন আরো অধিকতর বিপদগ্রস্ত বলে মনে হল। আমি তাকে বিপদমুক্ত করবার জন্যে বললুম—হাউ—মাউ—কাঁউ, এই রকম আর কি ! এতে সাহেব রেগে গিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন ইংরেজীতে বলে, নয়নতারাকে ছ'মাসের জেল দিয়ে দিলেন।

আমিও রেগে গিয়ে বললাম—যে ইংরাজরা আমাদের দেশের কান্না বুঝতে পারে না, তাদের কোর্টে আমি মোক্তারী করব না। বলুন ভাল করেছি কিনা ?

সরিৎ হেসে বললে—নিশ্চয়ই, আচ্ছা চলি।

অটল মোক্তার বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, আপনাকে অনেকক্ষণ আট্‌কে রেখেছি। বলে একটু থেমে বললেন—আচ্ছা আপনার কি মনে হয়, ওই লোকটি জিত্‌তে পারবে ? আপনার এজ্‌লাসেই তো মামলা রয়েছে !

সরিৎ বললে—কোন্ লোকটি ?

অটল মোক্তার বললেন—ঐ যে রামচরণ ভেড়া। আমাকে ছাড়া কি মধুবাবুর হাত থেকে লেনটিকে বের করতে পারবে? আপনাকে এমনিতেই জিজ্ঞেস করছি। অবশ্য আপনি যে রায় দেবার তাতো দেবেনই। তবে কি জানেন—এসব হল জটিল আইনগত ব্যাপার। লেনটি এখন মধুবাবুর অধিকারে রয়েছে কিনা!

সরিৎ গম্ভীরভাবে বললে—দেখুন, এসব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে রাজী নই।

অটল মোক্তার অপ্রতিভ হয়ে বললেন—ঠিক ঠিক, কিছু মনে করবেন না। তবে ঐ মধুবাবু লেনের যদুবাবুর মেয়েকে যদি তার বিয়ে করতেই হয়, তাহলে রামচরণ ভেড়াকে আমার কাছেই আসতে হবে। আচ্ছা চলি স্যার। নমস্কার।

সরিৎ হো হো করে হেসে উঠল। যা হোক এতক্ষণ হাকিমী করা গেল বটে! অর্থাৎ সেই পার্কে বসে অটল মোক্তার তাকেই হাকিম বানিয়েছিল কিনা! কিছুটা সময় কাটল বটে!

সরিৎ বাড়ী ফিরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু চোখ আর কান দুটোই সজাগ রাখল।

বিকেল তিনটা বাজতেই মমতার ব্যস্ত গলা শোনা গেল। টুটুলকে ডাকছে—টুটুল—টুটুল, গেলি কোথায়?

ছাদ থেকে সাঁড়া পাওয়া গেল টুটুলের—এই যে এখানে বৌদি।

মমতা ডেকে বললে—শুনে যা শীগ্‌গির।

লাফাতে লাফাতে টুটুল এসে হাজির হ'ল। মমতা বললে—চল্ বেড়িয়ে আসি।

টুটুল এক গাল হেসে বললে—বেড়াতে যাবে! কি মজা! বলেই মুখখানাকে চিন্তান্বিত করে বললে—কিন্তু—

মমতা বললে—আবার কিন্তু কি?

টুটুল বললে—আজ যে আমার ঝুমনীর পাকা দেখা!

মমতা হেসে ফেলে বললে—পাকা—পাকা কথা শোনো মেয়ের! হাত মুখটা একটু ধুয়ে আয়, জামা পরিয়ে দেব।

জামা পরতে পরতে টুটুল আবদার করে বললে—হ্যাঁ, বৌদি, আমার ঝুমনীর জন্যে একখানা কাপড় কিনে দাও না।

মমতা বললে—দেব—। বলে মুখ তুলতেই দেখে, রাজ্যের দুশ্চিন্তা চোখে মুখে মেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সরিৎ।

সরিৎ বললে—কোথায় যাচ্ছ বৌদি ?

মমতা বললে—যাচ্ছি টুটুলের ঝুমনীর জন্যে একখানা কাপড় আনতে। তারপর টুটুলের হাত ধরে বললে—নে-চল্।

যেতে যেতে টুটুল বললে—আমরা যে বেড়াতে যাচ্ছি, তা বুঝি ছোড়দাকে বলব না, না বৌদি ?

মমতা হাসি চেপে বললে—হ্যাঁ—। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে ছোড়দার দিকে তাকিয়ে টুটুল বললে—আমরা যে বেড়াতে যাচ্ছি তা তোমাকে বলব—না—। সুর করে টেনে টেনে বলতে বলতে মমতার সঙ্গে চলে গেল।

নাঃ, সন্দেহের যেটুকু অবকাশ ছিল, সেটুকু আর রইল না। বৌদি নির্ঘাত সেই বাড়ীতেই গেলেন! ব্যস্, হয়ে গেল! সরিৎ তার ঘরের মধ্যে এসে ছট্‌ফট্ করে ঘুরতে লাগল। এমন সময় অনিমেষ এসে ডাক দিল—সরিৎ আছিস ?

সরিৎ ঘরের মধ্য থেকে বলে উঠল—আমি নেই।

অনিমেষ বললে—সরিৎ!

সরিৎ চেঁচিয়ে বললে—আমি নেই—।

ঘরের মধ্যে ঢুকে অনিমেষ বললে—এই তো দিব্বি আছিস—! তোর অফিসে ফোন্ করলাম—তুই অফিসে যাসনি। তাই ভাবলাম তুই বাড়ীতেই আছিস।

সরিৎ বললে—আমি কি আর আমার মধ্যে আছি রে—?

অনিমেষ বললে—কেন, কী হলরে—?

সরিৎ বললে—নিজে তো স্বামীজী থেকে একেবারে নায়কটি সেজে বসে আছিস। আমার এদিকে কী হ'ল না হ'ল তার খোঁজ নেবার সময় কই তোর ?

অনিমেষ একটু হেসে বললে—ঝরণা আবার সব সময় সেজেগুজে থাকাটাই পছন্দ করে কিনা ?

সরিৎ বললে—ও, শুধু ঝরণা ! তা নামের ল্যাজ, মুড়ো গেল কোথায়— ?

অনিমেষের দেহে হাড়ের উপর যে পাতলা চামড়ার আবরণটুকু ছিল, তাতে যেন এখন বসন্তকালের ছোপ্ লেগেছে। চোখ মুখে তার তৃপ্তির হাসি। যেন জীবনে একটা পরম প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে !

অনিমেষ হেসে.বললে—আমরা উভয়ে একমত হয়ে, উভয়ের নাম থেকে কিছুটা ছাঁটাই করেছি। আমার যেমন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় ঐ 'হিমালয়' আর 'সিংহ' কথাটা শুনলে, ওরও তেমনি হাসির উদ্রেক হয়, আমার নামের শেষের 'মেষ' শব্দটি শুনলে। তাই—বলে সলজ্জভাবে হাসল অনিমেষ।

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সরিতের। বললে,—তাই তিনি ঝরণা, আর তুমি শুধু অনি-তে এসে দাঁড়িয়েছ—না ?

অনিমেষ বললে—হ্যাঁ, আমাকে ঝরণা, অনি বলেই ডাকে।

সরিৎ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে—কিন্তু আমি তোমার ঐ অনি-টা বাদ দিয়ে শুধু মেষ বলেই ডাকব। এদিকে তোর বুদ্ধিতে সেই কাঁটাপুকুরে গিয়ে আমার কী অবস্থা হয়েছে জানিস ?

অনিমেষ বললে—কাটা তো আর পড়িসনি ? শুধু ঝটিকা বাহিনী তোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে— ! এই তো ? সে তো শুনেছি। এখন অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটেছে কিনা ?

সরিৎ বললে—উন্নতি ? বরঞ্চ নিদারুণ অবনতি ঘটেছে ! বলে, চণ্ডীমাসীর এখানে আগমন থেকে আরম্ভ করে সব বিবরণ দিয়ে বললে—এই একটু আগে বৌদি নিজে গেলেন সেখানে তদন্ত করতে ।

অনিমেষ বললে—বলিস কি !

সরিৎ বললে—তবে আর বলছি কি ? গেলেন বোধহয় সেই বাড়ীউলীর কাছেই। বৌদি গেলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

অনিমেষ বেশ চিন্তিত ভাবে বললে—দাঁড়া দাঁড়া। না—বিপদটা তো বেশ ঘনীভূত বলেই মনে হয়।

সরিৎ ভেংচী কেটে বললে—এখন সেটাকে কী করে তরলীকৃত করা যায়, তাই বলুন প্রভু।

অনিমেষ বললে—দাঁড়া একটু ভেবে নিই। বলে মুখ গম্ভীর করে ভাবতে আরম্ভ করল। একটু বাদে বললে—আচ্ছা সেদিন আসবার সময় তো জামার পকেটটা সেই ঝটিকাবাহিনীর হাতেই রয়ে গেল, না?

সরিৎ বললে—হ্যাঁ।

অনিমেষ বললে—ওইটিই একটা বিপদের কারণ হয়ে রয়েছে কিনা—? জামার অংশটা যদি নিয়ে আসতিস।

সরিৎ বললে—আমি চাইলেই সে অমনি দিয়ে দিতো কিনা? আর চাইবার অবস্থাই সে সময় ছিল কিনা? আরে বাপু জামাটা যে ছিঁড়ে গেছে তাই তো টের পাইনি! তখন বলে জামা—মুণ্ডুটা ছিঁড়ে রাখলে টের পেতাম কিনা সন্দেহ। হুঁঃ—।

অনিমেষ বললে—এসব ব্যাপারে কোনো প্রমাণ প্রয়োগ রেখে আসতে নেই কিনা! তাই ভাবছি—শেষে তোর পেছনেও না কুকুর লেলিয়ে দেয়! তাহলেই তো হ'য়ে গেছে আর কি!

সরিৎ বললে—কুকুর লেলিয়ে দেবে কেন?

অনিমেষ বললে—আরে বাপু, পুলিশের কুকুরগুলোকে দেখিসনি কেমন শুঁকতে শুঁকতে গিয়ে অপরাধীকে ক্যাঁক্ করে ধরে ফেলে?

সরিৎ আঁতকে উঠে বললে—বলিস কি?

অনিমেষ বললে—হ্যাঁ। আচ্ছা দাঁড়া, আর একটু ভেবে নিই। বলে একটু চুপ করে থেকে বলে উঠল—ঠিক হয়েছে!

সরিৎ বললে—কী—?

অনিমেষ বললে—বৌদি গিয়ে ভালই হয়েছে!

সরিৎ বললে—সাধে কি আর তোকে আমি মেষ বলি রে? আরে তার চেয়ে যে আমার ফাঁসী যাওয়া ভাল, সেটা তুই বুঝিস? সে কথা যাক, একটা কাজ করা যাক।

অনিমেষ বললে—কী রে ?

সরিৎ বললে—আমিও না হয় ঝড়াত করে বেরিয়ে পড়ি।

অনিমেষ বললে—কোথায় ?

সরিৎ বললে—ট্যাক্সি করে চলে যাই সেই বাড়ীউলীর কাছে। গিয়ে সব কথা খুলে বলি তার কাছে। বলে সমর্থনের আশায় চেয়ে রইল অনিমেষের মুখের দিকে।

অনিমেষ বললে—ওরে বাব্বাঃ, সেটা যে আরো বৃহত্তর কেলেঙ্কারি হবে!

সরিৎ বললে—তাহলে এক কাজ করা যাক। বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। তোর গেরুয়া পোশাকগুলো আছে তো—সেগুলো দে, দিনকয়েক তীর্থে তীর্থে ঘুরে আসি।

অনিমেষ বললে—কিন্তু বাড়ীর লোক খুঁজবে যে!

সরিৎ বললে—দু'ছত্র লিখে রেখে যাব, আমাকে খুঁজে বৃথা সময় নষ্ট কোর না।

চিন্তিত ভাবে বললে অনিমেষ—কিন্তু ফেরার হলে, আসামীর অপরাধটা গুরুতর বর্তায় কিনা!

বিরক্ত হয়ে সরিৎ বললে—তাহলে কী কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলে পড়ব বলতে চাস ?

অনিমেষ বললে—না বাবা, ঝুলতে হয়, সেই ছাদ্‌নাতলায় গিয়েই ঝুলিস।

অসহায়ের মত বললে সরিৎ—ওঃ কী যে করি! বলে ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করতে আরম্ভ করল। মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরে বললে—কী রে, চুপ করে আছিস কেন—বল কিছু!

অনিমেষ এতক্ষণ চুপ করে মাথা নুইয়ে কী যেন ভাবছিল। এখন সে মাথা তুলে চাইল। তার মুখে একটু হাসি ফুটল। মনে হ'ল, এতক্ষণে যেন সে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে। বললে—ঠিক আছে! সরিতের মনেও আশার সঞ্চার হল। বললে—কী?

অনিমেষ বললে—ব্যস্, হাত-পা গুঁজে পিঠ শক্ত করে কচ্ছপের

মত মাটি কামড়ে পড়ে থাক। ঝড় ঝাপটা যা হবে, পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যাক, তারপর চোখ খুলবি।

সরিৎ একটা রক্তদৃষ্টি হেনে বললে—গাধা কোথাকার!

অনিমেষ বললে—আরে বাপু, এসব ব্যাপারে একটু আধটু কালি মুখে না মাখলে, প্রেমটা বেশ জমজমাট হয় না কিনা! নিজের ব্যাপারেই তো দেখলাম—বলে হেঃ হেঃ করে হাসতে লাগল।

পিত্তি জ্বলে গেল সরিতের। ভেংচী কেটে বললে—হে—হে—হে—। অমন হ্যা—হ্যা করে হাসবিনি কিন্তু বলে দিচ্ছি। আমার ভাল লাগে না।

সরিতের অসহায় অবস্থাটা বেশ আয়েসের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগল অনিমেষ। সে আরো জোরে হেসে উঠল।

সরিৎ রেগে মেগে গিয়ে বললে—দ্যাখ, এমন ঘুষি মারব যে তোর ঐ নাকটা কিন্তু—

অনিমেষ হেসে বললে—দাও ক্ষতি নেই। এ নাক কান—এমন কি প্রাণটা পর্যন্ত একজনের কাছে ইন্‌সিওর করা আছে।

সরিৎ বললে—বটে!

অনিমেষ বললে—চল্, তোকে একবার ঝরণা বিশেষ করে যেতে বলেছে। চল্—চল্—। বলে সরিতের কোনো আপত্তি না শুনে তাকে হাত ধরে টেনে পথে বের হ'ল।

দুপুরে একটা টানা ঘুম না দিতে পারলে, চণ্ডীমাসীর হাত পায়ের গাঁটগুলোও যেমন ছাড়ে না, তেমন গলাটাও তার খোলে না। তার উপর আজ সকাল থেকেই গলাটা তার ভাঙা-ভাঙা। সর্বনাশ! এই সময় গলা ভাঙলে কি চলে! এ যেন কোনো নামকরা কীর্তনিয়ার পালা গানের দিন গলা ভেঙে গেছে! কতকটা তাই তো বটে। শুধু কীর্তনিয়ার সঙ্গে করতাল মৃদঙ্গ বাজে, আর চণ্ডীমাসীর সঙ্গে তা নেই। এই যা তফাত। তা ভগবান তো একেবারে অবিবেচক নন। তিনি চণ্ডীমাসীর গলার মধ্যেই করতাল মৃদঙ্গ তো দিয়েছেনই

উপরন্তু একখানা ভাঙা কাঁসরও দিয়ে রেখেছেন। অতএব চণ্ডীমাসী যখন তার পালা গান শুরু করে তখন মনে হয় পূজা প্যাণ্ডেল থেকে উচ্চ গ্রামে লাউড্‌স্পীকার যোগে রেকর্ডে কোনো 'হিট্' গান বাজানো হচ্ছে। তা বললে কি হবে—, উঁচু পর্দা ছাড়া চণ্ডীমাসীর গলাটা আবার তেমন খেলে না কি না ? তা যার যা অভ্যেস।

সেই গলাটা তার আজ বসে গেছে। গলা বসে যাওয়া মানে চণ্ডীমাসীরও বসে পড়ার অবস্থা। তা গলার আর কী দোষ বলো! এই কদিন গলার উপর ধকলও তো কম গেল না! কিন্তু এত করেও লাভ কিছু হ'ল না। ঐ একদিনই যা একটু কথা কাটা-কাটি করে সুখ পেয়েছে। তারপর থেকে সেই যে দাঁতে কুটো দিয়ে বসেছে, তা এত গলাবাজি করেও ও পক্ষের মুখ খোলাতে পারল না।

কিন্তু চণ্ডীমাসী এতে দমে যায়নি। উৎসাহ তার এখনো অটুট আছে। শুধু বাদ সাধল গলাটা। তাই ভাবলে দুপুরে একটু ঠেসে ঘুম দিতে পারলে গলাটা খুলতে পারে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও আজ দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না—ঐ গেঁজেলটার জ্বালায়। আজ যে কী মতি হয়েছে ওর কে জানে, সকাল থেকে একবারও বাড়ীর বা'র হ'ল না। দাওয়াটার উপর বসে সমানে গাঁজা ওড়াচ্ছে, আর অনুসূয়াদের ঘরের দিকে চেয়ে হেঁড়ে গলায় তারস্বরে যতসব হিন্দী গান গাইছে। কয়েকবার তাড়া দিয়ে চণ্ডীরাণী হাল ছেড়ে দিয়েছে।

দুপুর বেলা একথালা ভাত বেড়ে চণ্ডীমাসী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—বলি গাঁজা খেলেই কি চলবে ?

গোপাল বললে—তা কী করব ?

চণ্ডীমাসী বললে—এখন এসে দয়া করে একথালা গিলে আমাকে উদ্ধার কর। তারপর গায়ে তাগত্‌ করে নিয়ে, আবার বসে গাঁজা খাও—গান গাও !

গোপাল একগাল হেসে বললে—গান শুনবি মাসী ? ভাল ভাল সিনেমার গান শিখেছি—। বলেই গলা ছেড়ে গান ধরল—হাড্‌ডী গাড্‌ডী গুল্ গুল্ দানা হাম্‌কো তুম্ পেয়ার করনা।

চণ্ডীমাসী ঝামটা দিয়ে বললে—মর মুখপোড়া, এখন খেতে ওঠ্। বলে ঘরে চলে গেল।

খেয়ে উঠে গোপাল হিন্দী ছেড়ে এবার বাংলা গান ধরল। একটার পর একটা গেয়েই চলেছে। মাতুরটা বিছিয়ে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে চণ্ডীমাসী বার বার চোখ বুজতে চেষ্টা করতে লাগল। বার বারই গোপালের গানের দমকে ঘুমটা ভেঙে যেতে লাগল। শেষে হন্যে হয়ে চণ্ডীমাসী বলে উঠল—অঃ মুখপোড়া বাঁদর,—তোর হ'ল কীরে? কিন্তু কে কার কথা শোনে!

হঠাৎ গোপাল তার গলাটা আর এক পর্দা চড়িয়ে তার প্রিয় গানটা ধরল। এই গানটা ধরার একটু কারণও ছিল। ওবাড়ী যাতায়াতের দেয়ালের মাঝখানের দরজাটা যদিও বন্ধ আছে, তার মানে ওবাড়ী থেকে বন্ধ করে দিয়েছে, তবু উঠোনে কাপড় শুকোতে দেবার যে উঁচু করে তার টাঙানো আছে, সেটা এবাড়ী থেকে দেয়ালের উপর থেকে দেখা যায়। হঠাৎ দেখা গেল সেই তারের উপর একখানা ভিজে শাড়ী কাপড় যেন উড়ে এসে পড়ে দু'দিকে সমান হয়ে নেমে গেল। পরক্ষণে সেটার প্রান্তভাগ ধরে কে যেন টেনে টেনে মেলে দিল। বলাবাহুল্য শাড়ীটি গোপালের পরিচিত। শুধু শাড়ী নয়, শাড়ীর মালিকও। গোপাল হাতে তাল ঠুকে গান ধরল—

রাধে তোর তরে
কদম তলায় বসে থাকি।

চণ্ডীমাসী—দুত্তোর, বলে উঠে পড়ে বললে—আঃ মরণ! আর কদমতলায় নয়, একেবারে নিমতলায় বসগে যাও। মুখপোড়া গেঁজেল কোথাকার, আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!

বিপদ! বিপদ! কারণ কথাগুলো যতটুকু জোর দিয়ে বলা দরকার, তারও অন্ততঃ চতুর্গুণ জোর দিয়ে বলেছে চণ্ডীমাসী। গলার শিরগুলো অসম্ভব রকম ফুলে উঠেছিল কথা বলবার সময়। কিন্তু তাতে ফল ফলল অল্পই। যেখানে পাড়াসুদ্ধ সকলের শোনার কথা, সেখানে দু'হাত দূরে বসা গোপালই শুনতে পেল কিনা সন্দেহ।

চণ্ডীমাসী যত জোর দিয়েই বলতে চেষ্টা করুক-না কেন, গলা দিয়ে ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বের হ'ল না।

হিঃ হিঃ করে গোপাল হেসে গড়িয়ে পড়ল। বললে—মাসী—তোর গলাটা যে একেবারে ব্যাঙের গলার মতন হয়ে গেল! তারপর হাতজোড় করে আকাশের দিকে চেয়ে বললে—হে ভগবান, মাসীর গলাটা যেন আর ভাল না হয়! এই ব্যাঙের মতই যেন থাকে।

চণ্ডীমাসী রেগে গিয়ে বললে—একেই বলে দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা! হে মাকালী, আজ রাতের মধ্যেই আপদটাকে নিয়ে নাও। আমি তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পুজো দেব!

গোপাল বললে—তা দিস্। এখন চারটে পয়সা দে দেখি, গাঁজা আনতে হবে।

চণ্ডীমাসী বললে—তোকে গাঁজা আনতে পয়সা দেব আমি—!

গোপাল বললে—তুই দিবি না তো কে দেবে?

চণ্ডীমাসী বললে—তুই আমাকে শাপ-শাপান্ত করবি, আর তোকে আমি পঞ্চ ব্যঞ্জনে খাওয়াব, গাঁজার পয়সা দেব—!

গোপাল বললে—শাপ-শাপান্ত কি আর সাধে করি, তুই যে ওদের সঙ্গে রাতদিন ঝগড়া করিস—তা ওদের সঙ্গে করিস ক্ষতি নেই। তুই যে ওর নামেও কুচ্ছা রটাচ্ছিস!

চণ্ডীমাসী বললে—কার নামে—কার কথা বলছিস?

গোপাল বললে—ওই যে তার কথা—। বলে পণ্ডিত মশাইর ঘর দেখিয়ে দিল।

চণ্ডীমাসী বললে—ওঃ! দরদ যে একেবারে উথলে পড়ছে! ওই কুলখাকীকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, তবে আমার নাম চণ্ডীমাসী।

রেগে গেল গোপাল। বললে—খবরদার বলছি মাসী—তাহলে তোর সঙ্গে আমার কিন্তু একটা হয়ে যাবে বলে দিলাম!

এবার গলার মায়া ছেড়ে দিয়ে চণ্ডীমাসী ছড়া কেটে বলতে আরম্ভ করল—কী, কী বললি—? বলি যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর! তারপর গোপালের নামের আগে বিশেষণ প্রয়োগ করতে

লাগল—তার কোনোটাই শ্রাব্য নয়। বিশেষণ শেষ করে যমের কাছে গোপালকে নিয়ে যাবার জন্যে আকুল আরজী পাঠিয়ে দিয়ে চণ্ডীমাসী গা ধুতে কলতলায় চলে গেল।

গোপালও হেসে গাঁজার সরঞ্জাম নিয়ে বসল। বললে—তা আমাকে যত খুশি বল, ওতে আমার কিছু যায় আসে না।

গা ধুয়ে উঠোনে কাপড়টা শুকোতে দিতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল—সতরর এক বাড়ী কোনটা বলতে পারেন— ?

চণ্ডীমাসী বলে উঠল—দুয়ারে তো লম্বর লাগানো আছে, দেখতে পাওনা বাছা! কাকে চাই— ?

চণ্ডীমাসীর কথা সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও তাকে দেখতে পেয়েই মমতা টুটুলকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে। মমতাকে দেখে চণ্ডীমাসী অবাক হয়ে বললে—কে গা— ?

মমতা হেসে বললে—আমি দিদি। সেই যে বেচু চাটার্জী স্ট্রীটে—।

চণ্ডীমাসী একগাল হেসে বললে—ওমা, তাই বলো! এসো এসো—, তা দেখো চোখের মাথা তো একেবারেই খেয়ে বসেছি কিনা! বোস বোস—, বলে দাওয়ার উপর মাদুরটা বিছিয়ে দিল। মমতা দাওয়ার উপর উঠতে গিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ গোপাল চোখ বুঁজে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে উদরস্থ গঞ্জিকার ধোঁয়াটা বেশ আরাম করে অল্প অল্প মুখ দিয়ে ছ:ড়ছিল। তারই গন্ধ নাকে যেতেই মমতা নাকে কাপড় দিল। চণ্ডীমাসী সেটা লক্ষ্য করে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—গোপাল—গোপাল—ওঃ গোপাল—সাড়া না পেয়ে দ্বিগুণ জোরে বলে উঠল—আঃ মল—! এযে দম ধরেই বসে রইল!

মমতা বললে—এই বুঝি আপনার সেই গোপাল ?

চণ্ডীমাসী বললে—হ্যাঁ মা, এ হচ্ছে আমার এক জ্বালা।

গোপাল এবার চোখ খুলল। চোখদু'টো তার রক্তবর্ণ। বললে—কী আমি তোর জ্বালা হ'লাম!

চণ্ডীমাসী দেখল বিপদ ! মমতার সামনে তো গোপালের গুণপনা ধরা পড়ে যাবে। তাই সে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললে—থাম্ বাবা থাম্। এখন একটু যা দেখি এখান থেকে, এর সঙ্গে দুটো কথা বলি। কারণ চণ্ডীমাসী মমতাকে দেখেই বুঝেছিল, যে মমতা অনুসূয়া সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতেই এসেছে।

গোপাল নড়ছে না দেখে চণ্ডীমাসী বললে—বলি কথা কী তোর কানে যায় না গোপাল ? যা না এখান থেকে—।

গোপাল বললে—আমি একেবারেই চলে যাচ্ছি। বলে উঠে সদর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চণ্ডীমাসী বললে—তা যা-না, একেবারে বিদেয় হ'য়ে যা-না। তাহলে তো বাঁচি। বোস—বোস—।

মমতা মাদুরের উপরে বসে বললে—তা এই গোপালের সঙ্গেই বুঝি সেই মেয়েটা—

চণ্ডীমাসী বললে—হ্যাঁ মা, আর বলো কেন— ?

মমতা বললে—তা ছেলেটিকে তো দেখলাম ভালই। শুধু যা একটু—

চণ্ডীমাসী বললে—তা ব্যাটাছেলে মানুষ, একটা অভ্যেস করে ফেলেছে ·বৈ তো নয়। কিন্তু গোপাল আমার হীরের টুকরো ছেলে !

মমতা বললে—সে কথা আর বলতে। বলে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করে বললে—তা তো দেখতেই পেলাম। তা এই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দেওয়াটা কিন্তু পণ্ডিত মশাইদের ভারী অন্যায়ই হয়েছে বলতে হবে।

চণ্ডীমাসী পণ্ডিত মশাইর বাড়ীর দিকে চেয়ে গলা উঁচিয়ে বললে —তাই একটু বল্ মা, একটু গলাটা উঁচু করে বল্। শুনুক—ঐসব ভালমানুষেরা একবার শুনুক।

মমতা বললে—আপনার গলাটা দেখি একদম বসে গেছে।

চণ্ডীমাসী বললে—তাও তো ঐ বজ্জাতদের জন্যেই। চেঁচিয়ে

চেঁচিয়ে গলাটা ভেঙ্গে ফেল্‌লাম তবু তো নড়াতে পারছিনে। যেন শিকড় গেড়ে বসেছে!

মমতা বেশ মজা পাচ্ছিল। শেখরের কাছে এবাড়ীর ভৌগোলিক অবস্থান জেনেই এসেছিল। তবু সাবধানের মার নেই। বললে—আমি যে এসেছি তা ওরা যেন টের না পায়; বুঝতে পেরেছেন তো? চলুন আমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে বসি।

চণ্ডীমাসী বললে—তার দরকার নেই। এখন এদিকে কেউ আসবে না। মেয়েটার বাপটা ফিরবে সেই রাত নটার সময়। তুমি বোস।

মমতা বললে—তা সেই মেয়েকে আপনার গোপালের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলেই কি আপনি রাজী হতেন? ঐ যে কে যেন ট্যাক্সি নিয়ে এসে ঘোরাঘুরি করছিল বলছিলেন?

চণ্ডীমাসী বললে—সেকি আর মিথ্যে বলেছি! সেদিন আমি তো তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম। দৌড়ে পালাতে গিয়ে সদরের পেরেকের সঙ্গে জামার একফালি রেখেই গিয়েছে। আচ্ছা, সত্যি কি মিথ্যে নিজের চোখেই দেখে যাও। আমি সেই জামার ফালিটা তুলে রেখেছি, প্রমাণ দেবার জন্যে। দাঁড়াও এনে দেখাচ্ছি। বলে উঠে গেল, এবং পরমুহূর্তে ঘরের মধ্যে থেকে জামার অংশটুকু এনে মমতার হাতে দিয়ে বললে—এই দেখো।

জামার ফালিটা হাতে নিয়েই মমতার চোখ বড় হয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেল আর একটি পকেটহীন জামার কথা একই রঙের কাপড়,—তারপর সেই জামার মালিকের এই কদিনের অসংলগ্ন কথা-বার্তা, অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ—সবটা মিলে যেন একটা দম্‌কা হাওয়ার সৃষ্টি করল। সেই হাওয়ায় মমতার মন থেকে সন্দেহের সবটুকু মেঘ মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে গেল। মুখে তার ফুটে উঠল দুষ্টুমির হাসি।

চণ্ডীমাসী বললে—কেমন, দেখলে তো?

মমতা বললে—হুঁ দেখলাম।

চণ্ডীমাসী বললে—তাহলেই বোঝ।

মমতা বললে—হুঁ, বুঝলামও।

চণ্ডীমাসী বললে—কী বুঝলে ?

মমতা বললে—বুঝলাম, এ জামাটা যার, সে খুব গুরুতর লোক গো দিদি।

চণ্ডীমাসী বললে—সেকি! তুমি চেন নাকি!

মমতা বললে—চিনি মানে, খুব চিনি। এ একজন পাকা চোর।

চণ্ডীমাসী চোখ কপালে তুলে বললে—চোর! বলো কী ? আমার কি সব্বনাশই না হ'ত!

মমতা বললে—আহা হা হয়নি যখন—তখন তো বড় বেঁচেই গেছেন। কিন্তু আবারও হয় তো আসতে পারে। একটু সাবধানে থাকবেন।

চণ্ডীমাসী বললে,—কী! আসবে! এই বাড়ীতে! বলি চণ্ডীমাসী কি মরে গেছে! আসুক না একবার!

টুটুল এতক্ষণ একটা ছোট নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে উঠোনের মধ্যে এক্‌লা দোক্‌লা খেলছিল। হঠাৎ বৌদির হাতের চক্‌চকে ফালিটা দেখে তার চোখ দুটো লুব্ধ হয়ে উঠল। সে বৌদির কাছে এসে আবদার করে বললে—কাপড়টুকু আমায় দাও না বৌদি, আমার ঝুমনীর কাপড় বানাব।

মমতাও এতক্ষণ ধরে ভাবছিল কী করে কাপড়টুকু নিয়ে যাওয়া যায়। এবার টুটুলের প্রস্তাবে সেই উপায়টা সহজ হয়ে গেল। সে চণ্ডীমাসীর দিকে চেয়ে হেসে বললে—দেখুন মেয়ের কাণ্ড! আসবার সময় কবুল করেছিলাম কিনা, ওর পুতুলের কাপড় কিনে দেব। তাই বায়না ধরেছে।

চণ্ডীমাসী ভাবলে তার কাজ তো হাসিলই হয়েছে! আর এটা রেখে কী হবে! তাই একটু হেসে বললে—তা দাও-না চাইছে যখন।

মমতা টুটুলের হাতে ফালিটুকু দিয়ে বললে—তা নাও—উনি বলছেন যখন। কিন্তু এরকম চাইতে নেই। লোকে তোমাকে হ্যাংলা বলবে।

চণ্ডীমাসীর মাথায় হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল। যদি সেই লোকটা

চোরই হবে, তবে মমতাই বা তাকে চিনবে কী করে? বললে—তুমি যে বললে বাছা, সেই লোকটাকে তুমি চেন। আচ্ছা কী করে চিনলে? সে তো হ'ল চোর। তাকে তুমি—

মমতা হেসে বললে—চিনি গো চিনি। আপনাকেও একদিন চিনিয়ে দেব। এখন চলি দিদি। চল্ টুটুল। হ্যাঁ আমি যে এসেছি তা যেন ওদের বলবেন না দিদি। বলে হেসে মমতা চলে গেল।

চণ্ডীমাসী মমতার গমনপথের দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে মুখখানাকে বিশ্রীরকম বিকৃত করে বললে—যত সব ঢং—!

চণ্ডীমাসীর বাড়ী থেকে বেরিয়েই টুটুলের কাছ থেকে জামার ফালিটুকু মমতা হস্তগত করে নিল। বললে—ওটা আমার হাতে দে টুটুল, পথে হারিয়ে ফেলবি।

টুটুলও সরল বিশ্বাসে বৌদির হাতে সঁপে দিল। সে কী করে বুঝবে যে এই ফালিটুকুর মধ্যে অনেক কেলেঙ্কারি জমা হয়ে আছে!

মমতা যখন ফিরে এল, তখন সরিৎ বাড়ী নেই। শেখরও তখন অফিস থেকে আসেনি। মমতা সোজা সরিতের ঘরে গিয়ে আলনা থেকে সেই জামাটা নামিয়ে ছেঁড়া ফালিটুকু মেলাতেই তার মুখে এক ফালি হাসি খেলে গেল।

শেখর কতক্ষণে বাড়ী আসবে তার জন্যে মমতার মনটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল। শেখর আসতেই মমতা মুখ গম্ভীর করে গিয়ে সামনে দাঁড়াল। মমতার মুখের দিকে তাকিয়েই ঘাবড়ে গেল শেখর। আজ সারাটা দিন নানান সন্দেহের দোলায় দুলেছে সে। মমতার তদন্তের ফলাফল কী হবে তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। শেখর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে—ওখানে গিয়েছিলে?

মমতা মুখে কিছু না বলে ঘাড় কাৎ করে জানাল যে সে গিয়েছিল।

শেখর বললে—তা কী বুঝলে?

মমতা কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

শেখর একটু অসহিষ্ণুভাবে বললে—কথা বলছ না যে!

মমতা বললে—কথা বলব কী, কথা বলবার মুখ কি তোমরা রেখেছ?

শেখর বললে—কী—হ'ল কী?

মমতা বললে—হ'ল কী বলছ? এসো আমার সঙ্গে। বলছি। বলে মমতা সরিতের ঘরের দিকে এগুল। বিস্মিত শেখর তাকে অনুসরণ করল। ঘরের মধ্যে এসে মমতা বললে—বোস এখানে। বলছি।

শেখর সরিতের বিছানার উপর বসল। মমতা জামাটা বের করে বললে—এ জামাটা কার চিনতে পার?

শেখর বললে—এটা খোকার জামা বলেই তো মনে হয়!

মমতা বললে—হ্যাঁ তারই। আচ্ছা জামার এই জায়গাটা ছেঁড়া দেখতে পাচ্ছ!

শেখর বললে—পাচ্ছি!

মমতা বললে—এবার এই ফালিটুকু এখানে মিলিয়ে দেখ দেখি।

শেখর ফালিটাকে যথাস্থানে লাগিয়ে বললে—মানে?

মমতা বললে—মানে সেই যে ট্যাক্সি নিয়ে—

শেখর বলে উঠল—এ্যাঁ—

মমতা বললে—হ্যাঁ। বলেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

শেখর বললে—বল কী—? বলে সেও হাসিতে ফেটে পড়ল।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই যেন হাসির পাল্লা দিতে লাগল। এমন সময় সরিৎ বাড়ী ফিরেই টুটুলকে সামনে পেয়ে বৌদির খোঁজ করে যখন জানতে পারল সে এই ঘরে আছে তখন সে সোজা নিজের ঘরে চলে এল। আর সরিৎ ঘরে ঢুকতেই মমতা হঠাৎ হাসি বন্ধ করে মুখ গম্ভীর করে শেখরকে বলে উঠল—তাহলে পণ্ডিত মশাইকে ঐ কথাই জানিয়ে দাও যে আমাদের ঐ সম্বন্ধ করা হবে না।

হঠাৎ মমতার এই গাম্ভীর্যের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে

মমতার মুখের দিকে তাকাতেই মমতার পিছনে সরিৎকে দেখতে পেয়ে সেও গম্ভীর ভাবে কোনোমতে আচ্ছা—বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মমতাও হাসি চেপে শেখরকে অনুসরণ করে।

সরিতের যেন হঠাৎ বোধশক্তি লোপ পেল। সে বোকার মত খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর জামাটা এবং ফালিটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তার দেহের রক্তটা যেন জমাট বেঁধে গেল। সে আস্তে আস্তে জামাটা আর ফালিটা হাতে তুলে চেয়ে রইল তার দিকে। হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তার যত রাগ গিয়ে পড়ল জামাটার উপর। সেটাকে সে দলা পাকিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর। মনে হ'ল যেন তার রাগ, দুঃখ, লজ্জা মেঝেতে আছড়ে পড়ে ছিট্‌কে গেল চারিদিকে।

বাড়ীটা যেন রহস্য উপন্যাসের ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন আস্তানার মত হ'য়ে উঠল। সারা বাড়ীময় একটা ফুসফাস, গুজগাজ। যেন কী একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে; অথচ সরিৎ সামনে গেলেই দাদা বৌদি একদম চুপ। অস্থির হয়ে উঠল সরিৎ। কতখানি কেলেঙ্কারি ঘটেছে তা জানতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। সারাক্ষণ চোরের মত অপরাধী সেজে ঘুরে বেড়ায় সরিৎ। কেউ তার সঙ্গে একটা কথা বলে না। এমনকি টুটুলটা পর্যন্ত না। শুধু দাদা আজ বললেন অফিস থেকে সাতদিন ছুটি নিতে। সরিৎ যে মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করবে, তাও তার দ্বারা হল না।

একদিন সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই মমতা এসে সরিৎকে বললে—আজ আর কোথাও বেরিও না যেন।

সরিৎ এবার ঝপ্‌ করে জিজ্ঞেস করে ফেলল—কী ব্যাপার বৌদি বল দেখিনি?

মমতা বললে—আমি কিছু জানি না বাপু। তোমার দাদা বললেন, আমি সেই খবরটা দিলাম মাত্র।

সরিৎ বললে—আচ্ছা সত্যি করে বল দেখি—

কথার মাঝখানেই মমতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—এই রে—তোমার দাদার চা বুঝি জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল। দাঁড়াও চা-টা দিয়ে আসি। বলে দ্রুত চলে গেল।

পড়েছে বেচারা বেকায়দায়, এখন যে যা বলে শুনে যেতে হবে বৈকি! সারাদিনে এক চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হ'ল না সরিৎকে। দাদা বৌদির মতলবটা যদিও সরিৎ বুঝতে পারল—কিন্তু কোথায় কার সঙ্গে সেটা সঠিক না বুঝতে পারা পর্যন্ত শান্তি নেই মনে। যদি ওখানে না হ'য়ে আর কোথাও হয়, তাহলে সেটা কি উচিত হবে! কী জানি কী করবে? কিছু বলার তো মুখ নেই। দেখতে দেখতে আত্মীয় স্বজনে বাড়ীঘর ভরতি হয়ে গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে সেজে গুজে অনিমেষ এসে হাজির। আরও দু চারজন বন্ধুবান্ধব এল। তাদের কাছ থেকে কথায় কথায় জানা গেল দাদাই তাদের গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছেন; নিমন্ত্রণ চিঠি আর ছাপানো হয়নি। মুখে মুখেই নিমন্ত্রণ হয়েছে। অথচ তারাও জানে না যে কোথায় বিয়েটা হবে। অনিমেষ তো আকাশ থেকে পড়ে বললে—সেকি! এযে যার বিয়ে তার দেখতে নেই, না কি একটা কথা আছে সেই রকম হ'ল আর কি! কিন্তু এতো শুধু দেখতেই নেই নয়, তোর বেলায় যে জানতেও নেই দেখছি। বলেই অনিমেষ বললে—দাঁড়া ট্যাক্সি ডেকে আনি, আমার উপর আবার ভার পড়েছে ট্যাক্সি ডাকার। বলে চলে গেল।

মমতা এসে জোর তাগাদা দিল—একি! এখনো মুখ হাত পা ধোওনি! শীগ্‌গির ধুয়ে এস। দু মিনিটের মধ্যে আসা চাই। আমি এক্ষুনি আসছি।

নূতন কাপড় জামা পরতে হ'ল সরিতের। চন্দন দিয়ে সাজাতে বসলে পর সরিৎ জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা বৌদি, কোথায় যাচ্ছি বলতো?

মমতা সহজ ভাবে বললে—যাচ্ছ বিয়ে করতে।

সরিৎ বললে—তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু কোথায়?

মমতা বললে—যেখানেই হোক, একজায়গায় হবেই। হবে না তো আমরা কি সকলের কাছে অপমানিত হব নাকি? সকলকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে যে?

শেখর এসে তাড়া দিল—একটু তাড়াতাড়ি করো। সময় বেশী নেই।

শাঁখ বেজে উঠল। সরিৎ যন্ত্রচালিতের মত দাদা বৌদিকে প্রণাম করে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। অনিমেষ পাশে বসল। গাড়িতে উঠবার আগে শেখর যেন কী তাকে বলে দিল। অনিমেষ হেসে ঘাড় কাৎ করল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

আর একখানা ট্যাক্সিও যাবে। সেই গাড়িতে যাবে টুটুল, শেখর ও আরও দুচারজন তাদের আত্মীয়। বেশী লোক নিয়ে বরযাত্রী যাওয়া শেখর পছন্দ করে না। সকলেই গাড়িতে উঠেছে, শেখরের দেখা নেই। মমতা তাকে খুঁজতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখে শোবার ঘরে রাখা বাবা মায়ের ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে শেখর চোখের জল ফেলছে। মমতার চোখও সজল হ'য়ে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে আস্তে আস্তে শেখরের পিঠে হাত রেখে বললে—যাও, লগ্ন পার হয়ে যাবে যে!

শেখর একবার মমতার মুখের দিকে তাকাল। তারপর চোখ মুছে ধীরে ধীরে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

বিয়েটা শেষ পর্যন্ত চণ্ডীমাসীর বাড়ীতে বসেই হ'ল। কারণ পণ্ডিত মশাইর সেই ছাত্রের বাবা খবর পাঠিয়েছেন ঘরদুটো সংস্কারের প্রয়োজন। এবং তা করতে প্রায় দিন পনর সময় লাগবে। এই ক'টা দিন যেন একটু পণ্ডিত মশাই সবুর করেন। এদিকে শেখর মাঝখানে একদিন এসে দেখা করে গেছে। তাকে পণ্ডিত মশাই তাঁর এই অসহায় অবস্থার কথা বলেছিলেন। এবং আকার ইঙ্গিতে চণ্ডীমাসীর কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। তাতে শেখর জোর দিয়েই বলেছিল—ঠিক সেই জন্যেই এবাড়ীতে বসেই বিয়েটা হবে।

বিয়েতে যথারীতি চণ্ডীমাসীকে নেমন্তন্ন করেছেন প্রভাময়ী। নেমন্তন্ন পেয়ে চণ্ডীমাসীর মনের অবস্থাটা বর্ণনা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। চণ্ডীমাসীরও নয়। শুধু সে বললে—কোথায় বিয়েটা দিচ্ছ শুনি ?

প্রভাময়ী একটু হেসে বললেন—যেখানে ওর কপালে লেখা ছিল। যাবেন কিন্তু দিদি। বলে প্রভাময়ী আর অপেক্ষা না করে চলে এলেন।

সন্ধ্যার পর বরবেশী সরিৎকে ঢুকতে দেখে, নিজের দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে চণ্ডীমাসী যেন ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠল। —আরে ! এ যে সেই— !

চণ্ডীমাসীর মনে পড়ে গেল সেদিনের সরিতের জামা ছিঁড়ে রেখে যাবার দৃশ্যটা। এরপর আর তার দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা ছিল না। ভাগ্যিস গোপালটা এখন বাড়ী নেই ! কোথায় যেন গাঁজার আড্‌ডায় গিয়ে জমেছে। আর জমেছে যখন ফিরবে সেই রাত বারোটা একটায়। সেটা থাকলে আবার কী ঘটিয়ে বসত কে জানে ? ওবাড়ীতে শাঁখ বেজে উঠল। মানসী ও মল্লিকার হাতে বন্দী হয়ে সরিৎ সদর দিয়ে ঢুকতেই চণ্ডীমাসীর সঙ্গে চোখো-চোখি হয়ে গেল।

চণ্ডীমাসী মুখখানা জঘন্য ভাবে বিকৃত করে বললে—যত সব ঢং—। বলেই ঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। সরিতের মনে যেমন আনন্দও হচ্ছিল তেমনি সদরের কাছে এসে তার মনে অতীতের একটা দুঃস্বপ্নের দৃশ্যও ভেসে উঠল। ক্ষণিকের জন্যে সে উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মানসী তাগিদ দিয়ে বলে উঠল—ওকি ! চলুন।

মল্লিকা হেসে টিপ্পনী কাটল—বুঝলিনি, লজ্জা—লজ্জায় পা বাড়াতে পারছেন না ! ঘোমটা দিয়ে দেব নাকি মশাই— ! হেসে উঠল মল্লিকা ও মানসী। পাশের একটি মেয়ে শাঁখে ফুঁ দিল।

ঘরের মধ্যে যেখানটায় অনুসূয়াকে সাজাচ্ছিল—সেখানে বারে

বারেই ঘুরে ঘুরে পণ্ডিত মশাই গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। চোখের অবাধ্য জলটাকে আজ যেন কিছুতেই রোধ করতে পারছিলেন না। তাঁকে দেখলে যেন চিনতেই পারা যাচ্ছে না। এ যেন সেই পণ্ডিত মশাই-ই নন। সেই আত্মভোলা সদানন্দময়, সংসারের আবিলতা কুটিলতা মুক্ত সদাশিব মানুষটি যেন আজ স্থির অচঞ্চল হয়ে গেছেন। তাঁর মুখ হয়েছে মূক, চোখ হয়েছে ভাষাময়। প্রভাময়ী ব্যস্ততার মধ্যেও উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছেন অনুসূয়াকে। আর পণ্ডিত মশাইকে মাঝে মাঝে তাগিদ দিচ্ছেন—এটা করো—ওটা করো, এখন কি দাঁড়িয়ে থাকার সময়!

একসময় পণ্ডিত মশাই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলেন—দেখো দেখো আমার মাকে যেন রাণীর মত দেখাচ্ছে—না গো? তারপর ভারী গলায় বললেন—কাল থেকে আমার ঘর যে ফাঁকা হ'য়ে যাবে—, তা কী করে সইব বলো!

প্রভাময়ী আঁচলে চোখ মুছে বললেন—আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। ওতে ওর অমঙ্গল হবে।

এমন সময় বাইরে শাঁখ বেজে উঠতেই প্রভাময়ী বলে উঠলেন—ওই এসে পড়েছে। যাও ওদিকে যাও।

তারপর শেখরের কথামত অনাড়ম্বর ভাবেই বিয়েটা হয়ে গেল।

শুধু বিয়ের আগে শেখর অনুসূয়াকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিল।

ফুলশয্যার দিন রাজ্যের লোককে নেমন্তন্ন করেছে শেখর। অনিমেষ আর ঝরণা সকাল থেকেই এসে গেছে। সরিৎ দেখল ঝরণা এখন আর সেই হিমালয় নেই। এখন সে ঝরণার মতই ছন্দময়ী হয়ে উঠেছে। ভাব দেখে মনে হ'ল অনি আর ঝরণার মিলিত জীবনই এই ছন্দকে এনে দিয়েছে।

ঝরণাকে দেখে সরিৎ হেসে বললে—কী—আবারও প্রশ্ন নাকি—?

ঝরণা হেসে বললে—সমাধান যখন হয়ে গেছে তখন আর প্রশ্ন করে লাভ কী ?

অনিমেষ বললে—কী রে—তখন বলেছিলাম কিনা এসব ব্যাপারে একটু আধটু কালি না মাখলে ব্যাপারটা বেশ ঘনীভূত হয় না !

সরিৎ বললে—তুমি একটি মেষ।

বাসরঘরে গান বাজনা হৈ হুল্লোড় খুব হ'ল। সবচেয়ে যেটা বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল—ঝরণার গান। ঐ বিপুল দেহ থেকে যে এমন মিষ্টি গান বেরোতে পারে তা নাকি উপস্থিত কারুরই কল্পনায় ছিল না। কিন্তু বিস্ময়ের তখনো কিছু বাকী ছিল।

রাত হলে পর যে যার সভাভঙ্গ করে পাশের ঘরে গিয়ে আসর জমাল। রইল শুধু সরিৎ একা বসে। অনুসূয়াকে একটু আগে মমতা ডেকে নিয়েছে বাড়ীর ভেতর খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু এত হুল্লোড়ের মধ্যে একজনকে দেখা গেল না। সে হ'ল টুটুল।

মমতা কী একটা কাজে যেন যাচ্ছিল ঘরের পাশ দিয়ে, সরিৎ দেখতে পেয়ে ডাক দিল—বৌদি, বৌদি, শোনো শোনো।

মমতা এসে বললে—কী বলছ বল ?

সরিৎ বললে—কী ব্যাপার বলো দেখি ?

মমতা বললে—দেখতেই তো পাচ্ছ। আজ তোমার ফুলশয্যা !

সরিৎ বললে—সেই কথাটাই তো জিজ্ঞেস করছি, পাকা দেখার পর থেকে এই ফুলশয্যা অবধি বেচু চাটার্জী স্ট্রীট আর বাগবাজারের কাঁটাপুকুর লেন তো কাঁটা বিছানোই ছিল জানতাম।

মমতা বললে—তা আর কী করব বলো ? তোমার যা অবস্থা হয়ে দাঁড়াল, তাতে সেই কাঁটার উপর দিয়েই আমাদের হেঁটে যেতে হ'ল। তোমার দাদাতো সেদিন হাত পা ছেড়ে বসেই পড়লেন। বললেন—ওগো, খোকাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

সরিৎ বললে—হুঁ, বললেন ?

মমতা বললে—বললেন বৈকি !

সরিৎ বললে—তা তুমি কী বললে ?

মমতা বললে—আমি বললাম, উঁহু, ডাক্তার নয়, শ্যামের হয়েছে অসুখ, শ্রীমতী হলেন বদ্যি। দাঁড়াও বাপু, তোমার শ্রীমতীকে এনে দিচ্ছি। বলেই চলে গেল ঘর ছেড়ে।

সরিৎ বললে—বৌদি বৌদি—শোনো ?

কিন্তু মমতা ফিরল না। একটু বাদে নববধূ বেশে অনুসূয়াকে নিয়ে মমতা এল। বললে—এই নাওশ্রীমান তোমার শ্রীমতীকে। আমি চলি।

সরিৎ বাধা দিয়ে বলে উঠল—বাঃ চললেই হ'ল। তোমার পাওনাটা তুমি নিয়ে যাবে না ?

মমতা ডান হাতখানা প্রসারিত করে বললে—বেশ দাও।

সরিৎ তখন অনুসূয়াকে লক্ষ্য করে বললে—মা মারা যাবার সময়, আমাদের আর সংসারকেএই বৌদির হাতেই তুলে দিয়েগিয়েছিলেন। সেই থেকেই বৌদি আমাদের মায়ের কর্তব্য করে আসছেন। এসো, সেই মায়ের স্মৃতি স্মরণ করে, আজ বৌদিকে আমরা প্রণাম করি।

সরিৎ আর অনুসূয়া যুক্তভাবে মমতাকে প্রণাম করল। অভিভূত হয়ে গেল মমতা। মুখে কিছু বলতে পারল না। শুধু ওদের মাথার উপর হাত দু'খানা রেখে নীরবে আশীর্বাদ করল। চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল কেন জানিনা টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে সেটাকে মুছে তাড়াতাড়ি বললে মমতা—ওঃ আমি যাই, টুটুলটাকে অনেকক্ষণ দেখছি না। বলে চলে গেল।

এবার শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরিৎ আর অনুসূয়া মনে হ'ল যেন খুব ঝড়বৃষ্টির পর মেঘমুক্ত নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। সরিৎ দরজাটা খিল এঁটে দিয়ে আস্তে আস্তে অনুসূয়ার কাছে এসে তার আনত মুখখানি তুলে ধরে আবেগের সঙ্গে বললে—আমি যে. এত দিন তোমার জন্যেই প্রতীক্ষা করে ছিলাম !

ধীরে ধীরে কাঁপা গলায় বললে অনুসূয়া—আমিও।

এমন সময় হঠাৎ খাটের নীচে শোনা গেল কে যেন বলছে—বল্ বল্—আমি যে তোমার জন্যে পীতিক্ষে করে ছিলাম !

চম্‌কে উঠে সরিৎ আর অনুসূয়া দু'জনে দু'দিকে সরে গেল। সরিৎ খাটের নীচে উঁকি দিয়ে বললে—কে রে? কে ওখানে?

খাটের নীচ থেকে জবাব এলো—আমি।

সরিৎ রেগে গিয়ে বললে—বেরিয়ে আয় মুখপুড়ী। বলে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল টুটুলকে। দেখা গেল টুটুলের হাতে দুটো পুতুল। কাপড়চোপড় গয়নাগাটি দিয়ে সাজিয়েছে।

ধমক্ দিয়ে বলে উঠল সরিৎ—ওখানে কী করছিলি—কে তোকে ওখানে আসতে বলেছিল—? বল্ বল্ হতচ্ছাড়ী। ধমক খেয়ে টুটুল বুঝল—কী যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছে। তাই সে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে—বারে—তা আমার কী দোষ! বৌদি যে বললেন—

সরিৎ চোখ কপালে তুলে বললে—বৌদি বলেছেন?

টুটুল জোর দিয়ে বললে—হ্যাঁ বলেছেনই তো। আমি যে বৌদিকে জিজ্ঞেস করলাম—বৌদি আজ এ ঘর এত সাজানো হচ্ছে কেন? বৌদি বললেন—যাদের নতুন বিয়ে হয় তারা এই ঘরে থাকবে। তা আমার রুমনি ঝুমনিরও তো নতুন বিয়ে হয়েছে। তাই তাদেরও এই ঘরে শোয়াতে এনেছিলাম। তারপর তোমরা যা যা বললে আমিও ওদের তা বলতে বলেছি। আমি ভেবেছি—এ বুঝি বিয়ের মোন্তর—বলে ভ্যাক্ করে কেঁদে ফেলল।

সরিৎ হাসি চেপে ধমক্ দিয়ে বললে—তোকে সুদ্ধ তোর রুমনি ঝুম্‌নির দফা রফা করব।

টুটুল গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়ে দিল—এঁ্যা এঁ্যা, বৌদি ও বৌদি—।

অনুসূয়া হেসে টুটুলকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। সরিৎ হো হো করে হাসতে লাগল। আর টুটুল দু'হাতে তার রুম্‌নি ঝুম্‌নিকে ধরে কাঁদতে কাঁদতে তার একান্ত ভরসা বৌদিকে ডাকতে লাগল—বৌদি—বৌদি—!

মধুরেণ!